সরস গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক ল্লো ল
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা ৬

সূচীপত্র
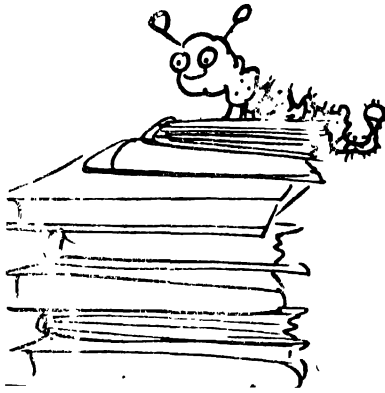
মুক্তপুরুষ হরিদাস

এটি মুক্তপুরুষ হরিদাসের জীবনী।

হরিদাস চক্রবর্তী বি-এ, বি-টি এখানকার স্কুলে অনেকদিন ধরিয়া মাস্টারি করিতেছেন। সম্প্রতি মুশকিল হইয়াছে এই যে, একে দিনে রাতে চোখের অসুখে তিনি রীতিমত ভুগিতেছেন, তাহার উপর হেড-মাস্টারের কড়া তাগাদা—হাফ-ইয়ারলির খাতাগুলো আর ক'দিন ফেলে রাখবেন মশাই? সব মাস্টারদের খাতা দেওয়া হয়ে গেল, আর আপনি ফাইভ্ উইক্স্ খাতা নিয়ে বসে আছেন—একখানাও দেখলেন না—এতে ক'রে স্কুলের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্চে।

হরিদাসবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন—চেষ্টা তো করচি স্যার, চোখের জন্যে পড়তে পাচ্চি না, দিচ্চি যত শীগ্গির হয়—

আবার তিন দিন গেল। আবার হেডমাস্টার কড়া তাগাদা দেন—কি মশাই? এখনো আপনি খাতা দিচ্চেন না?

—দিচ্চি স্যার, আর দু-পাঁচটা দিন—

—না মশাই, তা হবে না। আপনি পরশু নিশ্চয় খাতা দেবেন, নয়তো স্টেপ নিতে বাধ্য হবো। আমি কোনো অন্‌প্লেজ্যাণ্ট ব্যাপার করতে চাই নে, কিন্তু—

তার উপর বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে দিনরাত খাই খাই

করিতেছে, তাহাদের খাওয়ার আকাজ্ক্ষা মিটাইতে পারে, ত্রিভুবনে হেন রাপ-মা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামান্য বিয়াল্লিশ টাকা বেতনের স্কুল মাস্টার হরিদাসবাবু এই যুদ্ধের বাজারে আর কত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন?

খাতা একটি গাদা। সকালে উঠিয়া টিউশনি করিতেই সময় কাটিয়া যায়, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে একটা কথাবার্তা বলিবার পর্যন্ত সময় হয় না। বাজার করিতে হয় টিউশনি করিয়া ফিরিবার পথে। বাড়ীতে গিয়াই শুনিতে হয়, গিন্নি বলিয়া বসেন, আজ একখানা শাড়ী ত্যাখো, যেখানেই হোক, মেয়েটা কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে? তোমার না হয় গা হিম ক'রে বসে থাকলে চলে, আমার তো তা চলে না?

কাপড় কোথা হইতে আসে সে জ্ঞান যদি বাড়ীর মেয়েদের থাকিত। তাহা ছাড়া দু-এক মাস হয়, লোকে পারে। এই ব্যাপার চলিতেছে কি আজ? কতকাল হইতে এই অবস্থায় তিনি কালযাপন করিতেছেন বা আরও কতকাল করিতে হইবে, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপায় কি? উপায় তো কিছুই দেখেন না।

এই সময় আর একদিন হেডমাস্টারের কড়া কথা শুনিতে হইল পরীক্ষার খাতা ভাল করিয়া দাগ দিয়া না দেখার দরুণ। হেডমাস্টার বলিলেন—খাতাগুলো কি অমন ক'রে দেখে? ওতে ছেলেদের কি সুবিধে হবে মশাই? আপনি আজকাল কাজে বড় অমনোযোগী হয়েচেন, খাতাগুলো ফেরৎ নিয়ে যান, ওতে কাজ চলবে না।

সেদিন টিফিনের ছুটিতে স্কুলের গাছতলায় বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরিদাসবাবুর মনে হইল এ বিষম বিপদ হইতে কবে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। এই বন্ধন দশা চলিতেছে কতকাল। এমন কি কোনো উপায় নাই, যাহাতে তিনি এই দুঃখ, দারিদ্র ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধন এড়াইতে পারেন?

ভগবান এ প্রার্থনা শুনিলেন।

কি ভাবে তাহা বলি। বড় আশ্চর্য ঘটনা।

থার্ড ক্লাসের শ্রীপতি কুণ্ডু বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া কি বই পড়িতেছে হরিদাসবাবু দেখিতে পাইলেন। দু'বার বারণও করিলেন—এই কি হচ্ছে? অঙ্ক কষো—তাড়াতাড়ি কষো—

কিন্তু শ্রীপতি অঙ্ক কষিবে কেন, ভগবান যে অদ্য তাহাকেই দূত-রূপে প্রেরণ করিয়াছেন সংসারক্লিষ্ট হরিদাসের নিকট। এরূপ অলৌকিক ঘটনা আপনারা মহাপুরুষদের জীবনীর মধ্যে অনেক পাঠ করিয়াছেন, মনে করিয়া দেখুন। শ্রীপতি আবার লুকাইয়া সেই বইখানা পড়িতে লাগিল। এবার হরিদাসবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কান সজোরে মলিয়া দিলেন। পরে চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কৌতূহলবশতঃ বইখানা খুলিলেন। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোনো নাটক নভেল হইবে—অন্ততঃ ভূতের গল্প; কিন্তু তা নয়, বইখানার নাম 'বীর-বাণী', স্বামী বিবেকানন্দ রচিত। হরিদাসবাবু ধর্মের ধার কখনো ধারিতেন না, তবে বিবেকানন্দের নাম ভালই জানিতেন। বইখানা একবার পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া হাতে করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরদিন রবিবার। টিউশনি ছিল না। বাড়ীতে চা খাইয়া হরিদাস-বাবু বইখানা লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। এসব কি কথা! আমিই সেই! আমিই ভগবান। অহং ব্রহ্মাস্মি। সোঽহং।

কি মহান, বিরাট আইডিয়া! কি হিমালয়ের মত উদার গগনচুম্বী বাণী! হরিদাস মাস্টার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা গিয়া মহাব্যোমে ঠেকিল, স্বসংবেদ্য অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল, তিনি আজ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মা, ভগবান আর তিনি হাত ধরাধরি করিয়া যুগ-যুগ পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন, অনন্তকাল ধরিয়া, চলিবেন অনন্তকাল ধরিয়া। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক,

মহাবীর। জগৎকে বেদান্ত শিক্ষা দেবার জন্য, এই পরম সত্য প্রচার করিবার জন্য তিনি লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন—ক্রমে একথাও ধীরে ধীরে হরিদাসবাবুর মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধিতে লাগিল।

হরিদাস মাস্টার ব্রাহ্ম।

এক আধদিন নয়, সাতদিনে বইখানি অন্ততঃ পাঁচবার পড়িলেন। খাতা দেখিবার জন্য ফোর্থ ক্লাসের নুরুল হকের নিকট হইতে যে নীল পেন্সিলটা আনিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাগ মারিয়া পড়িলেন, ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ হইতে সংগৃহীত সাদা কাগজে অনেক ভালো কথা টুকিয়া রাখিলেন, রাত্রি জাগিয়া বইখানার মধ্যে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেন, মোটের ওপর বইখানি লইয়া মশগুল হইয়া রহিলেন।

ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু! তুমি বালকমাত্র, তুমি জানো না দুঃস্থ, হত-ভাগ্য শিক্ষকের জীবনে তুমি কি জিনিস দিলে। এ অনেকটা সেই ঘটনার মত। হরিদাসবাবু ও তাহার এক বন্ধু পায়ে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুপুর ঘুরিয়া গেল, দু'জনেই অভুক্ত। অবশেষে কোথাকার বাজারের এক অপকৃষ্ট হোটেলে তাঁহারা পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত খাইতে বসেন। তখন দুপুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুটি দারুণ ক্ষুধার মুখে ভাত পাইয়া মহা খুশ, খাইতে খাইতে গদগদকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—হরিদাস তুমি জানো না সিস্টেমকে তুমি কি দিলে!

হরিদাসবাবুর বড় মনে ছিল কথাটা।

শ্রীপতি কুণ্ডু তুমিও জানো না, হরিদাসবাবুকে তুমি কি দিলে।

এই সাতদিনে হরিদাসবাবু সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। এসব বাণী পৃথিবীতে আছে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। তিনিই বা কি করিয়া জানিবেন?

স্কুলে গিয়া শ্রীপতি কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে, ও বই

কোথায় পেলি ?

—আজ্ঞে ও দাদার বই।

—কোথায় পেলে রে তোর দাদা ও বই ?

—কোত্থেকে এনেছিল স্যার। আরও আছে ওইরকম দু'তিনখানা বই।

—আছে ? আজ টিফিনের সময় নিয়ে আসবি। অবিশ্যি করে—আনবি—বুঝলি ?

টিফিনের ছুটির পরে শ্রীপতি কুণ্ডু আরও দুখানা বই আনিয়া দিল। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির 'অধ্যাত্ম-দর্শন'।

হরিদাসবাবু যেটুকু সময় পান, বই দু'খানি পড়েন। দু'দিন টিউশনি কামাই করিলেন। হরিদাসবাবুর স্ত্রী তাগাদা দেন—তুমি এ দু'দিন ছেলে পড়াতে যাও নি যে ? আজও তো হিম হয়ে বসে আছ। টিউশনি আছে তো ?

—থাকবে না কেন ?

—তবে যাও না কেন ? ঐ দশটা টাকা আসে তাই দুধটা হয়। সকালের ছেলে পড়ানো চলে গেলে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাম জোগাবে কোথা থেকে ? আজও যাবে না নাকি ?

—আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—এই তো দিব্যি চা খেলে। যাও একবার বেড়াতে বেড়াতে, লালমোহন ঘোষ কথার লোক, সে-বার সেই জানো তো ? বেণুর বিয়ের জন্যে তিন দিন কামাই হয়েছিল বলে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ বসে থেকো না, যাও।

লালমোহনের তাগাদার চেয়েও গৃহিণীর তাগাদা কড়া। হরিদাস-বাবু স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলেন। অগত্যা বই লইয়া চলেন ছাত্রের বাড়ী। ছাত্রের বাবা লালমোহন ঘোষ বড় আড়তদার ব্যবসায়ী। ঘুঘু লোক।

লালমোহন বাড়ী ছিল না তাই রক্ষা। হরিদাসবাবু আর আগের মত অত ভয়ও করেন না। যা বলে বলিবে। পুস্তকের অধীত জ্ঞান যদি দৈনন্দিন কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারা গেল, তবে জ্ঞানের মূল্য রহিল কোথায়।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির পুস্তকেই আছে, "যে ব্যক্তি শুধু বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে অথচ একবারও আত্মচিন্তা করে না, ভগবানের সহিত একাত্মবোধ তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সেবা-ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছে, পাঠ করিয়াছে, কিন্তু কখনো ভিখারীকে একটা পয়সাও দেয় নাই, ভগবানকে চিনিতে বা বুঝিতে তাহার এখনো বহু বিলম্ব।"

হরিদাসবাবু ছাত্রকে ডাকিলেন—কেশব ?

ছাত্র বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল পরশু এলেন না স্যর ?

হরিদাসবাবু আগে আগে এক্ষেত্রে বলিতেন, অসুখের জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার তিনি সে লোক নহেন। এত ভয় কিসের ? লালমোহন ঘোষের তিনি ধার ধারেন না। সত্য কথা বলিবেন, ইহাতে ভয় করিলে চলে না। অতএব বলিলেন—এমনি একটু অসুবিধে ছিল।

—বাবা বলছিলেন, তাই বলছি, স্যর।

—কি বলছিলেন ?

—বলছিলেন। জানেন তো বাবাকে। ওইরকম লোক।

—তা কি হবে এখন ? বাড়ীতে অন্য কাজ ছিল। পড়ো।

ছেলেকে অঙ্ক কষিতে দিয়া হরিদাস মহেশ্বরানন্দ গিরির বই পড়িতে লাগিলেন।

"বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পারেন যে জগৎ ব্রহ্ম, সাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগতকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়।"

"যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ববিধ সংস্কার বর্জিত হইয়াছেন,

তাঁহারা আপনাকে ও বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।”

হরিদাসবাবুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, জ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে। সব সংস্কারের একটি সংস্কারও তাঁহার নাই। ব্রহ্ম ও তিনি যে এক, এ জ্ঞান তাঁহার মর্মে মর্মে ঢুকিয়াছে।

কি ভয়ানক কথা!

এত সহজে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়ানো যায়, কেহ এতদিন তাঁহাকে বলে নাই কেন?

পুনরায়—“মুক্ত-পুরুষসহ উপযুক্ত অবলম্বন করিয়া উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন।”

সাধন তো তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তিনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধন না হইলে দিব্যজ্ঞান হয়? দিব্যজ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে অথবা যদি বাকি থাকে, সামান্যই বাকি।

“তদবস্থায় গুণাতীত আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।”

উঃ, ও সব কথা এতদিন কোথায় ছিল!

পুনরায়—“সময় না হইলে তত্ত্বসমূহ জীবের নিকট প্রকাশ করা হয় না। যে উপযুক্ত পাত্র, মহাপুরুষবাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, শুধু তাঁহারই নিকট গভীর শাস্ত্রতত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে।”

ধন্য মহেশ্বরানন্দ গিরি! ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু!

আজ সময় হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইলে এ তত্ত্ব তাঁহার চোখের সামনে ভগবান মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দিন-কুড়ি কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, হরিদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না। আগের সে হরিদাসবাবু একেবারেই নাই। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে সে কি আর সাধারণ মানুষ থাকে। হরিদাসবাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আগের মত ভীরু তিনি আর নাই, টিউশনির ছাত্রের পিতাকে আর তত গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক কি?

কিসের ভয় তাঁর? তিনি অজর অমর আত্মা। দু'দিনের জন্য লীলা-খেলা করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই তাই ছোট হইয়া ছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বাধীন হইবেন।

সর্বপ্রথমে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

সেদিন ভাবিলেন, স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলেন কিন্তু সাহসে কুলাইল না। দশটার সময় আহারাদি সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রতিদিনের মত বাহির হইলেন কিন্তু স্কুলে গেলেন না।

পথের মধ্যে আলতাপোলের খালের ওপর যে পুল আছে, তাহার নীচে ঘাসের উপর ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দু'খানা অধ্যাত্মতত্ত্বের পুস্তক। একপ্রকার লুকাইয়াই রহিলেন এইজন্য যে স্কুলের ছেলেরা স্কুলে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্কুলে গিয়া হেডমাস্টারের কাছে বলিয়া দিবে অথবা বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট। চুপচাপ থাকিয়া বই পড়িতে পড়িতে বিড়ি টানিতে লাগিলেন। বিড়ি ফুরাইয়া গেল। অসুবিধা হইতে লাগিল। বাজার স্কুলের কাছে। সেখানে বিড়ি কিনিতে গেলে কেউ টের পাইবে। কি করা যায়?

রাস্তা দিয়া একটি লোক বিড়ি টানিতে টানিতে যাইতেছে। কে লোকটা? হরিদাসবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। একটা বিড়ি কি চাহিবেন? নাঃ, লোকটি কি মনে করিবে।

হরিদাসবাবু ডাকিলেন—ওহে শোনো—

লোকটি রেলিং হইতে নীচের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবু?

—নেমে এসো। বাজারে যাচ্চ কি? দু'পয়সার বিড়ি আমার জন্যে আনবে?

—দাঁড়ান বাবু।

সে নামিয়া আসিল। বলিল—এখানে কি করচেন বাবু?

—এই—এই—ইয়ে কাঠের গাড়ী আসচে কিনা. তাই বসে আছি। কাঠ কিনবো।

লোকটা চলিয়া গেলে হরিদাসবাবুর মনে অনুতাপ হইল। ছিঃ, বিড়ির আসক্তিতে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন? আর বিড়ি খাইবেন না? বিড়ি ত্যাগ করিলেন আজ হইতে। অবশ্য এই তুই পয়সার বিড়ি খাইয়া লইবেন আজকের মত।

বেলা চারটার পর হরিদাসবাবু পুলের তলা হইতে বাহির হইয়া বাড়ী আসিলেন। দিব্যি চা খাইলেন, যেমন স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রতি-দিন খাইয়া থাকেন।

আবার পরদিনও সেই রকম। তবে এবার পুলের তলায় নয়, মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। অদ্য একটি বাণ্ডিল বিড়ি বসিয়া বসিয়া পুড়াইলেন।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। দশটায় বাড়ী হইতে রোজ বাহির হন, আবার ঠিক সাড়ে চারটায় বাড়ী আসিয়া পৌঁছান। কোনো হাঙ্গামা নাই, মুক্ত মন মুক্ত জীবন। এতাদনে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বোধহয় ভগবান অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করেন, সাধককে আরও উন্নত করিবার জন্য। সেদিন বাড়ী ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—আজ মাইনে হয়েচে?

হরিদাসবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—মাইনে?

—হ্যাঁ গো, মাইনে হয় নি?

—না।

—কেন হয় নি? আজ তো ইংরেজী মাসের সাত তারিখ। পাঁচ তারিখে তো তোমাদের মাইনে হয়।

—আজও হয় নি।

—ইদিকে তো আর চলে না। হাজারী মেছুনি রোজ তাগাদা আরম্ভ করেচে, গায়ের মাংস খুলে খাচ্ছে। দুধওয়ালী আজ সকালেও তাগাদা দিয়েচে—তাদের বলে রেখেচি তুমি আজ মাইনে আনবে।

—তা আজ না দিলে আমি কি করবো?

—চালও বাড়ন্ত। কাল কি হবে তার ঠিক নেই। কি খেয়ে কাল ইস্কুলে যাবে? কাপড় একজোড়া না কিনলে এমাসে, বাড়ী থেকে আর বেরুনো যাচ্চে না।

—না যায় বেরিও না—

এই কথায় গৃহিণী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু করিলেন। বড় মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, আমার বই এনে দিলে না?

—কি বই?

—কবিতা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। না কিনলে বুড়ো মাস্টার রোজ বকে। তুমি কালই কিনে দাও বাবা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। এখন যা।

গৃহিণী ও ঘর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—কাল থেকে তোর ইস্কুলে যেতে হবে না। যতদিন না বই কেনা হয়, ততদিন ইস্কুলে যাবি নে, খবরদার বলচি।

সংসার অসার তো বটেই, ঘোর অশান্তিময়। এসব তিনি গ্রাহ্য করেন না, স্ত্রী বকিতেছে বকুক। নারীজাতির স্বভাবই ওই! তাঁহার মন ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এসব সাংসারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব অতি তুচ্ছ জিনিস, তিনি এসবের উর্দ্ধে আছেন। চিরকাল তো তোমাদের দাসত্ব করিলাম, এখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, চোখ রাঙাইয়া আর সাবেক পথে ফিরাইতে পারিবে না। বকিতেছে, বকিয়া মরুক।

মানুষ কত সহজে দেবতা হয়, তাঁহার জানা ছিল না। দেবতা কে,

না যে সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণপথে উদিত হইল। জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতিকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে সে-ই তো অধ্যাত্ম-রাজ্যের একজন বড় গাঁতি-দার বা তালুকদার। তিনি আজ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আছেন। কিসের বলে? ব্রহ্মোপলব্ধির বলে। আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভের বলে। অতএব তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি দেবতা।

পরদিনের প্রভাতটি যেন তাঁহার কাছে তাঁহার নবজীবনের প্রভাতের মত ঠেকিল।

কি সুন্দর শরতের ঝলমলে আলো গাছে-পাতায়। কি সুন্দর বিহঙ্গকাকলী। এসব যেন নতুন চোখে আজ দেখিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর দৃষ্টি নয়। হরিদাসবাবু যে সে কথা বুঝিলেন না তা নয়, তবু ভাল লাগিল এই শরতের আলো, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ।

কবির দৃষ্টি তাই কি, কবি কি জ্ঞানী নয়?

সবে আসিয়া বাইরের ঘরে বসিয়াছেন, এমন সময় হাজারী মেছুনি আসিয়া বলিল—বাবা ঠাকুর উঠেচেন? দু'দিন আমি আপনার দেখাই পাই নে। পেন্নাম হই। ইয়ে গিয়ে আমার ও-মাসের সেই চিংড়ি মাছের দরুণ সাতসিকে পয়সা বাকি। আজ না দিলি চলবে না। মহাজনের টাকা বাকি, আজ তাদের দেনা শোধ দিতি হবে।

হরিদাসবাবু বলিলেন—আচ্ছা এখন যা—বেলা হলে আসবি।

—কত বেলা হ'লি?

—আঃ, বিরক্ত করলে! এই বেলা ন'টা দশটা।

—বাবা ঠাকুর, আপনি ব্যাজার হবেন না, ব্যাজার হ'লি চলে? আমরা হচ্চি গরীব লোক। আপনার দোর থেকে নিয়ে গিয়ে তবে খাব। একটু বেলা হ'লি আসবো এখন, দামটা চুকিয়ে দেবেন এখন।

মেছুনী চলিয়া গেল।

হরিদাসবাবু সকাল দশটার আগেই ভাতে ভাত খাইয়া গিয়া পুলের তলায় বসিলেন। মুশ্‌কিল এই যে, বিড়ি ফুরাইয়াছে। নগদ পয়সার অভাব। যে কয়টি খুচরা আনি দুয়ানি পকেটে ছিল, স্ত্রীকে দিয়া আসিতে হইয়াছে।

যাক গে। আশাতে আসক্তির বন্ধন। সর্ব-বন্ধন-মুক্ত না তিনি। তিনি না অজর, অমর আত্মা? বিড়ি না টানিলে কি হয়? বিড়ি ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া গীতার ভাষ্য পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর এই ভাষ্যখানি সম্প্রতি পাড়ার রামতারণ মুখুয্যের কাছে চাহিয়া লইয়াছেন। বুড়ো রামতারণ ঘুঘু লোক, সুদখোর মহাজন, গীতার মহিমা সে কি বুঝিবে? টাকার আণ্ডিল, একটা পয়সার সদ্ব্যয় নাই। গীতা অত সহজ জিনিস নয়।

আর একদিন এভাবে কাটিল।

তাগাদার চোটে পথে ঘাটে বাহির হওয়ার জো নাই। বাড়িতেও তিষ্ঠিবার জো নাই। গত মাসের মাহিনা দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে স্কুলের, হরিদাসবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ ইংরাজি মাসের এগারো তারিখ। চার তারিখে মাহিনা হওয়ার দিন। এদিকে আর চলে না। একরাশ দেনা, দুধওয়ালী দুধ বন্ধ করিবে কাল হইতে।

বাড়িতে গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁগা, আর তো চলে না। এবার কি তোমাদের মাইনে হবে না? এত দেরি করচে কেন এবার? আজ ইস্কুলে গিয়ে ভালো ক'রে বলো পোড়ারমুখো হেডমাস্টারকে।

তেরোদিন অনুপস্থিতির পর হরিদাসবাবু আজ স্কুলে গিয়া গুটি গুটি হাজির হইলেন।

তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। হরিদাসবাবুর পা কাঁপিতেছে। জিভ্ শুকাইয়া গিয়াছে। এতদিন কামাই করিবার কি কৈফিয়ৎ দিবেন। বড় কড়া হেডমাস্টার।

হেডমাস্টারের অফিসে কম্পিত পদে দুরু-দুরু বক্ষে ঢুকিতেই হেড-

মাস্টার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এতদিন কি হয়েছিল আপনার ?

ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ হরিদাস সে চশমা-পরা চোখজোড়ার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—স্যর, ইয়ে—বাড়ীতে বড্ড অসুখ। তলপেটে যন্ত্রণা। তাই নিয়ে আজ এ ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেচে। তার ওপর রাত জেগে নার্স করতে হচ্চে। আর তো দ্বিতীয় লোক নেই বাড়ীতে। কি কষ্টে যে যাচ্চে স্যর। একে পয়সার অভাব, ডাক্তারে-ওষুধেই বিশ পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়ে গেল—বড় বিপদে পড়ে গিয়েচি স্যর—

হেডমাস্টার বলিলেন—বুঝলাম। আপনার একটা খবর দিতে কি হয়েছিল ? অসুখ-বিসুখ হতে পারে, সেটা আশ্চর্য নয়—বাট ইউ অট টু হ্যাভ ইনফর্মড্ মি—স্কুলের ইণ্টারেস্ট সাফার করচে, এ জ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল। আপনি না পুরনো টিচার ? না, এরকম হ'লে হরিদাসবাবু, আই অ্যাম সরি টু টেল ইউ, আমাকে সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হ'তে হবে আপনার নামে—

এবারটা স্যর এক্সকিউজ করুন দয়া ক'রে। আমার মাথার একদম ঠিক ছিল না এ ক'দিন, সে কি কষ্ট আর যন্ত্রণা রাত্রে, যদি দেখতেন স্যর তবে আপনারও কষ্ট হোত—এগারো দিন রাত্রে ঘুমুই নি, ঠায় শিয়রে জেগে বসে আছি স্যর—চোখে দেখা যায় না সে যন্ত্রণা—

হরিদাসবাবু কাঁদো-কাঁদো হইলেন।

পার্থক্য

সকাল হইতে ভিখিরীর উপদ্রব লাগিয়াই আছে।

এদিকে ঘরে চাউল নাই, ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। গৃহিণী জানাইলেন চাউল যা আছে তাহাতে আর দিন চারেক চলিবে। বাজারে চাউল নাই একথা বলিলে ভুল হইবে, আছে চোরাবাজারে, সাঁইত্রিশ টাকা মন।

গৃহিণীকে শুনাইয়া বলি—ভাতের ফ্যানে যা কিছু সার অংশ থাকে। ফ্যান যে ফেলে দেওয়া হয় ওতে সত্যিই আমাদের বড্ড··· মানে যা কিছু পুষ্টিকর ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সাহেবরা ফ্যান ফেলে না, জাপানীরা ফেলে না।

আমার ইঙ্গিত বাড়ীর কেহই বুঝিল না। ঝরঝরে ভাতই খাইতে লাগিলাম।

শুনিলাম আর দু'দিন চলিবে। তার উপর ভিখিরী। সকাল হইতেই শোন—মা দুটি চাল দেন, মা একটু ফ্যান—

মনে সহানুভূতি জাগায় না, রাগ ধরে। ঘরে নাই চাউল, কেবল ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও, সকাল হইতে। হিসাব করা চাউল আজকাল। এদিকে বাজারে ও-দ্রব্য প্রায় অমিল। সাঁইত্রিশ টাকা করে চাউল

কিনিয়া কতদিন চালাইব। কায়ক্লেশে যদি বা চলে, ভিখিরীর উপদ্রবে আর তো পারি না! অথচ ভিক্ষা মিলিবে না বলিতে পারি না, সংস্কারে বাধে।

বাল্যে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে দেখিতাম, মুষ্টিভিক্ষা হইতে ফকির বৈষ্ণবকে কেহ কখনো বঞ্চিত করিত না। সেই হইতে কেমন একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে—ভিক্ষা না দিয়া পারি না।

কিন্তু আসিলে বিরক্ত হই। না আসিলেই যেন ভালো।

সকালে ছোট ঘরে বসিয়া লিখিতেছি চাকর বাজার হইতে বাড়ী ঢুকিল হাতে মাঝারি গোছের একটি পুঁটুলি! বাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েরা কি চাউল আনিতে পাঠাইয়াছিল? ভাঁড়ার খালি? বলিলাম —ওতে কি রে?

রাজেন চাকরটি জিনিসটা লুকাইয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ভাবে বুঝিলাম। ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—চাল আজ্ঞে।

—ও, কত?

—দু'সের করে চাল আজ্ঞে জহুরীর দোকানে। কন্‌ট্রোল—

—ও, কনট্রোলের দোকান তাহোলে এখানেও হ'ল? কত দিচ্চে?

—দু' টাকার বেশি দেবে না আজ্ঞে।

এটা বাঙলা নয়, বিহার। তবুও এখানে কন্‌ট্রোল খুলিল, দু' টাকার বেশি চাউল কাহাকেও দেওয়া হইবে না—এ সব কি?

একজন ভিখিরী আসিয়া হাঁকিল—ভিক্ষে দেন মা চাড্ডি ভিক্ষে—

রাজেন বলিল—ভিক্ষে হবে না যাও, চাল নেই—

লিখিতে লিখিতে বলিলাম—দে এক মুঠো দে—

সঙ্গে সঙ্গে আসিল আর একজন। তাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইল।

বেলা ন'টা আন্দাজ সময়ে আরও দুইজন। ভিক্ষা লইয়া তাহারাও

চলিয়া গেল। এইবার একজন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মনে তখন বিরক্তি ধরিয়াছে, রাজেনকে বলিলাম, ভিক্ষা না দেয়। কিন্তু তবুও লোকটা কেন দেরি করিতে লাগিল, কেন তবুও যায় না, বার বার একঘেয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। বড়ই রাগ হইল। বাহির হইয়া বলিলাম—ভিক্ষে হবে না, চলে যাও—আবার কি?

লোকটি বৃদ্ধ। পরনে একটুকরা মলিন নেকড়া, হাতে তোবড়ানো টিনের মগ। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা বটে, তবে বাংলাদেশের ভিখারির মত কঙ্কালসার নয়।

লোকটা মগটা তুলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল—একটু ফ্যান দাও বাবা—বড্ড খিদে পেয়েচে—

রাগিয়া বলিলাম—কি আব্দার রে। আবার ভাতের ফ্যান—

—দেন বাবা একটুখানি—

—ভাগ এখান থেকে! যাঃ—আব্দার ছাখো—কোন সকালে রান্না হয়েচে, এখন ফ্যান রয়েচে ওর জন্যে।

লোকটা হতাশভাবে চলিয়া গেল, আবার লিখিতে বসিলাম। ইহাতে আমার সংস্কারে বাধিল না। প্রতিদিনের বরাদ্দ মুং মুষ্টি-ভিক্ষা তো দিয়াছি। ক'জনকে দেওয়া যায়? বেলা বাড়ল, স্নান করিতে যাইব। এমন সময় একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি গায়ে অর্ধমলিন পিরান, পায়ে চটি জুতা, হাতে এক গাছা বাঁশের লাঠি, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ?

মুখ তুলিয়া তারের বেড়ার ওপারে চাহিয়া বলিলাম—কেন, কি চাই?

লোকটা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো—

প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

—বাবু, ঢুকবো বাড়ীর ভেতর? আমিও ব্রাহ্মণ।

—হ্যাঁ আসুন।

লোকটা বাড়ীতে ঢুকিল বটে, কিন্তু বারান্দায় না উঠিয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া বলিল—একটা কথা আছে। অনেক খুঁজেচি, ব্রাহ্মণ বাড়ী পাই-ই নি। আমার বাড়ী নদেশান্তিপুর—মুসাবনীতে আমার এক আত্মীয় কাজ করে, সেখানেই যাচ্ছি। সঙ্গে একটা ছোট ছেলে আছে, ওই আমতলায় বসিয়ে রেখে এসেছি। একটু খাবার জল যদি আমাদের দেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তার আর বেশী কথা কি—বিলক্ষণ। ডেকে আনুন।

ছেলেটিও আসিল। দেখিয়া বুঝিলাম ইহারাও দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুক। মুখে খাদ্য চাহিতে পারিতেছে না। বলিলাম—আপনাদের খাওয়া হয়নি তো. এত বেলায় কোথায় যাবেন—এখানেই দুটো ডাল ভাত—

—না না, একটু জল খেয়েই যাবো। আপনাকে আর কেন বিরক্ত··· মুসাবনীতে আমার ভাইপো—

সে কি হয়! বসুন বসুন—মুসাবনী এখান থেকে ছ'মাইল পথ।

না খাওয়াইয়া ছাড়িলাম না। দু'জনে খাইয়া দাইয়া বিশ্রাম করিয়া বিকালের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইবার সময় হঠাৎ মনে পড়িল—এ কেমন হইল? ভাতের ফ্যান চাহিতে ভিখিরীর উপর রাগিয়া উঠিলাম, অথচ নদে-শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ শুনিয়া আদর করিয়া দু'জনকে খাওয়াইলাম, এখন তো চাউল বাঁচাইবার কথা মনে উঠিল না?

কেন এমন হয়?

ভাবিয়া দেখিলাম—ইহার কারণ সে ভিখিরী আমার শ্রেণীর মানুষ নয়। নিজেকে আমি ভিখিরীরূপে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে নিজেকে নদীয়াবাসী দরিদ্র-ব্রাহ্মণরূপে অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি।

আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা

আইনস্টাইন কেন যে দার্জিলিং যাইতে যাইতে রানাঘাটে নামিয়াছিলেন বা সেখানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে "On……ইত্যাদি ইত্যাদি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন…একথা বলিতে পারিব না। আমি ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমি আপনাদের নিকট সরবরাহ করিতে অপারগ, তবে আমি যেরূপ অপরের নিকট হইতে শুনিয়াছি সেরূপ বলিতে পারি।

আসল কথা, নাৎসী জার্মানী হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর হইতে বোধ হয় আইনস্টাইনের কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, বক্তৃতা দিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে আগমন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেনও একথা সকলেই জানেন, আমি নূতন করিয়া তাহা বলিব না।

কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন গণিতের অধ্যাপক রায়বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। সেনেট হলে আইনস্টাইনের অদ্ভুত বক্তৃতা "On the Unity & Universality of Forces" শুনিয়া অন্য পাঁচজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মত তিনিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কলেজে আইনস্টাইনকে আনাইয়া একদিন বক্তৃতা দেওয়াইবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল

আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

তিনি বলিলেন—"না রায় বাহাদুর, আমার অন্য কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এমন দিনে একজন জার্মান—"

রায় বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন (যেমন ধরনের উত্তেজিত হইয়া তিনি উঠিতেন সন্ধ্যায় রামমোহন উকিলের বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠের সময়, অন্য কেহ যদি কোন বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপন করিত)—"সে কি মহাশয়! জার্মান কি? জার্মান? আইনস্টাইন জার্মান? ওঁদের মত মহামানবের, ওঁদের মত ঋষি বৈজ্ঞানিকের দেশ আছে? জাতের গণ্ডি আছে? আমি বলি—"

প্রিন্সিপাল বললেন—"আমিও বলছি নে যে তা আছে। কিন্তু বর্তমানে যেমন অবস্থা"—দুই প্রবীণ অধ্যাপকে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত, তিনি মধ্যযুগের স্কলাস্টিক দর্শনের প্রধান আচার্য জন স্কোটাসের উদাহরণ দেখাইলেন। আয়র্লণ্ডে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও নবম শতাব্দীর গোঁড়াদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ফ্রান্সে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আয়র্লণ্ডে আর ফিরিতে পারিয়া-ছিলেন কি? আসল মানুষটাকে কে দেখে! তাঁর মতামতেরই মূল্য দেয় লোকে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল রাজি হইলেন না তখন রায় বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার কানে গেল আইনস্টাইন শীঘ্রই দার্জিলিং যাইবেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি হিমালয় দেখিতে পারেন নাই। এইবার এত কাজে আসিয়া আর দার্জিলিং না দেখিয়া ছাড়িতেছেন না।

রায় বাহাদুর ভাবিলেন দার্জিলিঙের পথে রানাঘাটে নামিয়া লইয়া সেখানে এক সভায় আইনস্টাইনকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলে কেমন হয়?

রায় বাহাদুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করিলেন।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ভারতবর্ষের দর্শনের কথা আমায় কিছু বলুন।"

রায় বাহাদুর প্রমাদ গণিলেন। তিনি গণিতের অধ্যাপক; দর্শন, বিশেষত ভারতীয় দর্শনের কোন খবর রাখেন না, তবুও ভাগ্যে গীতা মাঝে মাঝে পড়া অভ্যাস ছিল; সুতরাং অকাল সমুদ্রে গীতারূপ ভেলা (কোন আধ্যাত্মিক অর্থে নয়) অবলম্বন করিয়া দু-এক কথা বালবার চেষ্টা করিলেন। 'বাসাংসি জীর্ণানি' ইত্যাদি!

আইনস্টাইন বলিলেন, "ম্যাক্সমূলারের বেদান্তদর্শনের উপর প্রবন্ধ পড়ে এক সময়ে সংস্কৃত শেখার বড় ইচ্ছে হয়। দর্শনে আমি স্পিনোজার মানসশিষ্য। স্পিনোজার দর্শন গণিতের ফমে ক্রমানুসারে সাজানো। স্পিনোজার মন গণিতজ্ঞ স্রষ্টার মন, সেজন্য আমি ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু বেদান্ত সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়ে আমি নতুন এক রাজ্যের সন্ধান পেলাম। ইউক্লিডের মত খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক মন স্পিনোজার, সেখানে কূটতর্কও বাঁধা পথে চলে। আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে কল্পনাবিলাসী—।"

রায় বাহাদুর অবাক হইয়া আইনস্টাইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি?"

আইনস্টাইন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার কালের সঙ্গে ক্ষেত্রের একত্র মিলনকে আপনি কল্পনার ছাঁচে ঢালাই করা বিবেচনা করেন না নাকি?"

রায় বাহাদুর আরও অবাক। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "নতুন ডাইমেনশানের সন্ধানদাতা আপনি, নিউটনের পর নববিশ্বের আবিষ্কারক আপনি—আপনাকে কল্পনাবিলাসী বলতে—"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর কবিসুলভ

দীর্ঘ কেশ ও স্বপ্নভরা অপূর্ব চোখের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। কল্পনা প্রখর না হইলে হয়তো বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, রায় বাহাদুর ভাবিলেন। কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, আইনস্টাইন পাশের ছোট টেবিল হইতে চুরুটের বাক্স আনিয়া রায় বাহাদুরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। নিজের হাতে একটি মোটা চুরুট বাহির করিয়া ছুরি দিয়া ডগা কাটিয়া রায় বাহাদুরের হাতে দিলেন। রায় বাহাদুরের বাঙালী মন সংকুচিত হইয়া উঠিল। অত বড় বৈজ্ঞানিকের সামনে সিগার ধরাইবেন তিনি, জনৈক হেঁজিপেঁজি অঙ্কের মাস্টার? তাছাড়া সাহেবও তো বটে, সেটাও দেখিতে হইবে তো। সাহেব জাত কাঁচাখেগো দেবতার জাত। রায় বাহাদুর একটা সিগার তুলিয়া বলিলেন—"আপনি?"

—"ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করি নে।"

—"ও!"

—"কি, বলুন।"

—"রানাঘাটে সভা করলে কেমন লোক হবে আপনার মনে হয়? কেমন জায়গা রানাঘাট?"

—"জায়গা ভালই। লোকও হবে।"

—"কিছু টাকা এখন দরকার। যা ছিল জার্মানিতে রেখে এসেছি। ব্যাঙ্কের টাকা এক মার্কও তুলতে দিলে না, একরকম সর্বস্বান্ত।"

—"আমি রানাঘাটে বিশেষ চেষ্টা করছি, সার।"

—"ওখানে বড় হল পাওয়া যাবে কি?"

—"তেমন নেই। তবে মিউনিসিপ্যাল হল আছে, মন্দ নয়, কাজ চলে যাবে।" রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইতে চাহিলেন, ভাবিলেন এত বড় লোকের সময়ের ওপর অত্যাচার করিবার দরকার নাই।

আইনস্টাইন বলিলেন—"আমার কিছু ছাপা কাগজ ও বিজ্ঞাপন

নিয়ে যান। যে বিষয়ে বক্তৃতা হবে, সে আপনাকে পরে জানাব, টিকিটের দাম কত করব ?”

—“খুব বেশি নয়—এই ধরুন—”

—“তিন মার্ক—দশ শিলিং ?”

—“আজ্ঞে না সার। সর্বনাশ! এ সব গরিব দেশ। দশ শিলিং আজকাল দশ টাকার কাছাকাছি পড়বে। ও-দামে টিকিট কেনবার লোক নেই এদেশে, সার।”

—“পাঁচ শিলিং ?”

—“আচ্ছা, তাই করুন। ছাত্রদের জন্য এক শিলিং।”

আইনস্টাইন হাসিয়া বলিলেন, “ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। আমি নিজেও স্কুল-মাস্টার। আমার ওপর তাদের দাবি আছে। বম্বে ও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেও তাই হয়েছিল। ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। এই নিয়ে যান ছাপা হ্যাণ্ডবিল ও কাগজপত্র—

রায় বাহাদুর হ্যাণ্ডবিল হাতে পাইয়া পড়িয়া দেখিতে গিয়া বিষণ্ণ-মুখে বলিলেন—“এ কি সার ? এ যে ফরাসী ভাষায় লেখা !”

—“ফরাসী ভাষায় তো বটেই। প্যারিসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছাপিয়েছিলাম। কেন ফরাসী ভাষা বুঝবে না কেউ। আমি তো সেদিন শুনলাম এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় ?”

—“আজ্ঞে না। সে হয়তো এক-আধজন বুঝতে পারে। সেভাবে ফরাসী ভাষা পড়ানো হয় না। এখানে ইংরিজিটাই চলে। কেউ বুঝবে না সার।”

—“তাই তো! আপনি ইংরিজিতে অনুবাদ করে নিয়ে ওখানে কোনও প্রেসে ছাপিয়ে নেবেন দয়া করে ?”

—“তা—ইয়ে—তা—আচ্ছা সার।”

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন—এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে

বিনোদের শরণাপন্ন হইগে। ছোকরা ভাল ফ্রেঞ্চ জানে। কাঁহাতক আর একজন এত বড় লোকের সামনে 'জানি নে মশাই' বলা যায়!

বিনোদ চৌধুরী তাঁর বড় শালা। পণ্ডিত লোক। অনেক রকম ভাষা তার জানা আছে। সে উৎসাহের সঙ্গে হ্যাণ্ডবিলগুলির বাংলা ও ইংরিজি অনুবাদ করিয়া দিয়া বলিল,—"চাটুয্যে মশায়, আমি রানাঘাট যাব সেদিন। আমার থিওরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে পরিচয় অবিশ্যি লিণ্ডেন বুলটনের পপুলার বই থেকে। তবুও আইনস্টাইনকে আমি এ যুগের ঋষি বলে মানি। সত্যকার দ্রষ্টা ঋষি। সত্যকে যাঁরা আবিষ্কার করেন, তাঁরাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। লম্বা লম্বা মার্কা ইকোয়েশন বুঝতে না পারি, কষতে না পারি, কিন্তু কে কি দরের সেটুকু— ।"

রায় বাহাদুর দেখিলেন চতুর শ্যালকটি ঠেস দিয়া কথা বলিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"অর্থাৎ সেই সঙ্গে আমার দরটাও বুঝি ঠিক করে ফেললে বিনোদবাবু? বেশ, বেশ।"

—"রামো! চাটুয্যে মশায়, ছি, ছি, তেমন কথা কি আমি বলি?"

—"বল না?

—"স্পেস—টাইম—কনটিনিউয়ামের মোহজালে পড়ে কোন্‌টা কখন কি অবস্থায় বলেছি, তা কি সব সময় হলফ নিয়ে বলা যায় চাটুয্যে মশায়? এবেলা থেকে যাবেন না?"

—"না না আমার থাকবার জো নেই। অনেক কাজ বাকি। যাতে ত্'পয়সা হয় ভদ্রলোকের, সে ভার আমার ওপর। দেখি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানদের একটু ধরাধরি করিগে। ঘুঘু সব। হলটা যদি পাওয়া যায়—

—"কি বলেন আপনি চাটুয্যে মশায়! আইনস্টাইনের নাম শুনলে হল না দিয়ে কেউ পারবে? আহা, শুনলেও কষ্ট হয়, অত বড় বৈজ্ঞানিককে আজ এ বৃদ্ধ বয়সে পয়সার জন্যে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে—দি ওয়ার্লড ডাজ নট নো ইট্‌স গ্রেটেস্ট—"

—"তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিনোদ। ঐ যা শেষকালে বললে ঐ কথাটাই ঠিক। অনেক ধরাধরি করতে হবে। পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনেই যাই।"

ইহার পরের কয়েকদিন রায় বাহাদুর অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন। রানাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, স্কুলের হেডমাস্টার, উকিল, মোক্তার, সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসাদারগণের সঙ্গে দেখা করিয়া সব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করিলেন, সকলেরই যথেষ্ট উৎসাহ, সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ। যেন সবাই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চলিয়াছে।

বৃদ্ধ মোক্তার অভয়বাবু বলিলেন,—কি নামটি বললেন মশাই সাহেবের? আ—কি? আ—ইন্ স্টাই—ন্? বেশ বেশ। হ্যাঁ, বিখ্যাত নাম। সবাই জানে। সবাই চেনে। ওঁরা হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ—নাম শোনা আছে বইকি।"

রায় বাহাদুর রাগে ফুলিয়া মনে মনে বলিলেন—তোমাদের মুণ্ডু শোনা আছে, ড্যাম ওল্ড ইডিয়ট! এ তুমি কাপুড়ে মহাজন শ্যামচাঁদ পালকে পেয়েছ? স্বনামধন্য! তিন জন্ম কেটে গেলে যদি এ নাম তোর কানে পৌঁছয়। মিথ্যে সাক্ষী শিখিয়ে তো জন্ম খতম করলি, এখন আইনস্টাইনকে বলতে এসেছে স্বনামধন্য পুরুষ! ইডিয়সির একটা সীমা থাকা চাই।

নির্দিষ্ট দিনে রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর কলেজের কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে লইয়া সকালের ট্রেনে রানাঘাটে নামিলেন। তাঁর শালা বিনোদ চৌধুরী দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, বিশেষ কার্যবশত তাহার আসা সম্ভব হইল না, আইনস্টাইনের বক্তৃতা শোনা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে, ইত্যাদি। সেজন্য রায় বাহাদুরের মনে দুঃখ ছিল, ছোকরা সত্যিকার পণ্ডিত লোক, আজকার এমন সভায় বেচারীর আসিবার সুযোগ মিলিল

না। ভাগ্যই বটে।

রানাঘাট স্টেশনের বাহিরে আসিয়া সম্মুখের প্রাচীরে নজর পড়িতে রায় বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। এ কি ব্যাপার! প্রাচীরের গায়ে লাটকানো ঢাউস এক তু-তিন-রঙা বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা আছে—

বাণী সিনেমা গৃহে (নীল)
আসিতেছেন! আসিতেছেন!! (কালো)
আসিতেছেন!!! (কালো)
কে ?? (কালো)
কবে ?? (কালো)
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী (লাল)
অদ্য রবিবার ২৭শে কাতিক সন্ধ্যা ৫৷৷০ টায় (নীল)
জনসাধারণকে অভিবাদন করিবেন!! (কালো)
প্রবেশমূল্য ৫, ৩, ২, ও ১ টাকা (কালো)
মহিলাদের ৫ ও ২ টাকা (কালো)
এমন সুযোগ কেহ হেলায় হারাইবেন না। (লাল)

কি সর্বনাশ!

রায় বাহাদুর রুমাল বাহির করিয়া কার্তিক মাসের শেষের দিকের সকালেও কপালের ঘাম মুছিলেন। তাহার পর একবার ভাল করিয়া পড়িলেন তারিখটা। না, আজই। আজ রবিবার ২৭শে কার্তিক।

অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন আর একখানা বিজ্ঞাপন। ক্রমে যতই যান, সর্বত্রই সেই তিনরঙা বিজ্ঞাপন। মিউ-নিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত যাইতে অন্তত ছত্রিশখানা সেই বিজ্ঞাপন আঁটা দেখিলেন বিভিন্ন স্থানে।

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু ফুলবাগানের সামনে ছোট বারান্দায় বসিয়া তেলধুতি পরনে তেল মাখিতেছিলেন। রায় বাহাদুরকে

দেখিয়া ভাল হইয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"খুব সৌভাগ্য দেখছি। এত সকালে যে?—নমস্কার!"

—"নমস্কার, নমস্কার! চানের জন্য তৈরী হচ্ছেন! ছুটির দিনে এত সকাল যে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, চানটা সকালেই করি।"

—"বাড়ীতে?"

—"আজ্ঞে না, চূর্ণীতে যাই। ডুব দিয়ে চান না করলে—অভ্যেস সেই ছেলেবেলা থেকেই। বসুন, বসুন। আজ যখন এসেছেন তখন দুপুরে গরীবের বাড়ীতেই দুটো ডাল-ভাত—"

—"সেজন্যে কিছু না। নো ফরম্যালিটি। আমার মাসতুতো ভাই নীরেনের ওখানে না গেলে রাগ করবে। সেবার তো যাওয়াই হোল না।"

—"তাহলে চা চলবে তো?"

—"তাতে আপত্তি নেই সে হবে এখন। আসল যে জন্যে আসা—তা এ এক কি হাঙ্গামা দেখছি। কে ইন্দুবালা দেবী আসছে বাণী সিনেমাতে আজই—"

—"হ্যাঁ, তাই তো দেখছিলাম বটে।"

—"দিন বুঝি আজই?"

—"তাই তো—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক্ল্যাশ করবে কিনা?"

—"এখন তো আমরা দিন বদলাতে পারি না। সব ঠিকঠাক। আমাদেরও হ্যাণ্ডবিল বিলি, বিজ্ঞাপন বিলি, সব হয়ে গিয়েছে। আইনস্টাইন আসবেন এই দার্জিলিং মেলে।"

—"আমিও তো ভেবেছি। তাই তো—"

—"তবে আমার কি মনে হয় জানেন। যারা সিনেমাতে ইন্দুবালাকে দেখতে যাবে, তারা সাহেবদের লেকচার শুনতে আসবে না। সাহেবদের সভায় যারা আসবে, তারা ঠিকই আসবে।"

আইনস্টাইনকে 'সাহেব' বলিয়া উল্লেখ করাতে রায় বাহাদুর মনে

মনে চটিয়া গেলেন। এমন জায়গাতেও তিনি আনিতে চলিয়াছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে। এ কি পাটকলের ম্যানেজার, না রেলের টি. আই., যে 'সাহেব' 'সাহেব' করবি ? বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয় তো!

মুখে বলিলেন,—"হাঁ, তা বটে।"

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু তাঁর অমায়িক আতিথেয়তার জন্যে রানাঘাটে প্রসিদ্ধ। চা আসিল, সঙ্গে এক রেকাবি খাবার আসিল। রায় বাহাদুর চা-পানান্তে আরও নানা স্থানে ঘুরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, অনেক কিছু ঠিক করিতে হইবে।

যাইবার সময় বলিলেন—"মিউনিসিপ্যাল হলের চাবিটা—"

শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আমাদের হলের চাকর রাজনিধিকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বাসার চাকরও যাবে। ওরা হল খুলে সব ঠিক করবে। সেখানে ফ্রী রিডিং রুম আছে, সকালে আজ ছুটির দিন খবরের কাগজ পড়তে লোকজন আসবে। তাদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোকরা তাদের ধরে বেঞ্চি সাজিয়ে নিচ্ছি। কিছু ভাববেন না।"

শ্রীগোপালবাবু স্নান করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই তাঁহার বড় মেয়ে (শ্রীগোপালবাবু আজ তিন বৎসর বিপত্নীক, বড় মেয়েটি শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়াছে, সেই সংসার দেখাশুনা করে) বলিল,—"বাবা, আমাদের পাঁচখানা টিকিট করে এনে দাও।"

—"কিসের টিকিট ?"

—"বা রে, বাণী সিনেমায় ওবেলা ইন্দুবালা অসেছে—নাচগান হবে। সবাই যাচ্ছে আমাদের পাড়ার।"

—"কে যাচ্ছে ?"

—"সবাই! এই মাস্তর রাণু, অলকা, টেঁপি, যতীন কাকার মেয়ে টেঁড়স—এরা এসেছিল। ওরা সব বক্স নিচ্ছে একসঙ্গে—বক্স নিলে

মেয়েদের আড়াই টাকা করে রিজার্ভ টিকিট দিচ্ছে। আমাদের জন্যে একটা বক্স নাও!"

শ্রীগোপালবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন,—"হ্যাঁ ভারি—আবার একটা বক্স! বড্ড টাকা দেখেছিস আমার। সেই ১৯০৩ সাল থেকে জোয়াল কাঁধে নিয়েছি, সে জোয়াল আর নামল না। কেবল টাকা দাও আর টাকা দাও—"

অপ্রসন্ন মুখে দেরাজ খুলিয়া মেয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট ও কয়েকটি খুচরা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

একটু পরে প্রতিবেশী রাধাচরণ নাগ আসিয়া বৈঠকখানায় উঁকি মারিয়া বলিলেন—"কি হচ্ছে শ্রীগোপালবাবু?"

—"আসুন ডাক্তারবাবু, খবর কি? যাচ্ছেন তো ও বেলা?"

—"হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনারা যাচ্ছেন তো?"

—"যাব বই কি? রানাঘাটের ভাগ্য অমন কখনও হয়নি। যাওয়া উচিত নিশ্চয়।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। টাকা-খরচ—ও তো আছেই। কিন্তু এমন সুযোগ—বাড়ীর সবাই ধরেছে, দিলাম দশটা টাকা বের করে। বলি বয়েস তো হোল ছাপ্পান্নর কাছাকাছি, কোন্‌দিন চোখ বুজব, তার আগে—"

—"নিশ্চয়। জীবনে ওসব শোনবার সৌভাগ্য কবার ঘটে? আমাদের রানাঘাটবাসীর বড় সৌভাগ্য যে উনি আজ এখানে আসবেন।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। বয়েস হয়ে এল, দেখে নিই, শুনে নিই--গেলই না হয় গোটাকতক টাকা।"

—"তা ছাড়া, অত বড় বিখ্যাত একজন—"

—"সে আর বলতে! আজকাল সব জায়গায় দেখুন ইন্দুবালা দেবী, সাবানের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, গন্ধতেলের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা,

শাড়ির বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালার ছবি! তাকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য —বিশেষ করে রানাঘাটের মত এঁদোপড়া জায়গায়—সৌভাগ্য নয়? নিশ্চয় সৌভাগ্য!”

শ্রীগোপালবাবু হাঁ করিয়া নাগ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ঝাড়া মিনিটদুই পরে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—“আমি কিন্তু সে কথা বলছি নে। আমি বলছি সায়েবের লেকচারের কথা, মিউনিসিপ্যাল হলে।”

রাধাচরণবাবু ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন—“কোন্ সাহেব?”

—“কেন, আপনি জানেন না? আইনস্টাইন—মিঃ আইনস্টাইন!”

রাধাচরণবাবু উদাসীন সুরে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে বলিলেন,—“ও, সেই জার্মান না ইটালিয়ান সায়েব? হ্যাঁ—শুনেছি, আমার জামাই বলছিল। কি বিষয়ে যেন লেকচার দেবে? তা ওসব আর আমাদের এ বয়সে—লেখাপড়ার বালাই অনেকদিন ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওসব করুগগে কলেজের ইস্কুলের ছেলে-ছোকরারা—হ্যাঁ!”

শ্রীগোপালবাবু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাধাচরণবাবু পুনরায় বলিলেন,—“তা আপনি কি করবেন শুনি?”

—“আমার বাড়ীর মেয়েরা তো যাচ্ছে সিনেমায়। তবে আমাকে যেতেই হবে সায়েবের বক্তৃতায়। রায় বাহাদুর নীলাম্বরবাবু এসে খুব ধরাধার করছেন—”

—“কে রায় বাহাদুর? নীলাম্বরবাবুটি কে?”

—“কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসার। তাঁর উদ্যোগে সব হচ্ছে। তিনি এসে বিশেষ—”

রাধাচরণবাবু চোখ মিটকি মারিয়া বলিলেন,—“আরে ভায়া, একটা কথা বলি শোন। একটা দিন চল দেখে আসা যাক! ছবির ইন্দুবালা আর জ্যান্ত ইন্দুবালাতে অনেক ফারাক। ইহজীবনে একটা কাজ হয়ে যাবে। ওসব সায়েব-টায়েব ঢের দেখা হয়েছে। দু’বেলা রানাঘাট

ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে থাক দার্জিলিং মেলের সময়ে—দেখ না কত সায়েব দেখবে। কিন্তু ভায়া এ সুযোগ—বুঝলে না?"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"তা—তা—কিন্তু, তবে রায় বাহাদুরকে কথা দেওয়া হয়েছে কিনা, তিনি কি মনে করবেন—"

রাধাচরণবাবু মুখ বিকৃত করিয়া খিঁচাইবার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"হ্যাঃ! কথা দেওয়া হয়েছে রায় বাহাদুরকে! ভারি রায় বাহাদুর! এত কি ওবলিগেশন আছে রে বাবা। বলো এখন, বাড়ীর মেয়েরা সব গেল তাই আমায় যেতে হোল। তারা ধরে বসল তা এখন কি করি। বলি কথাটা তো নিতান্ত মিথ্যে কথাও নয়!"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—"তা—তা—তা তো বটেই। সে কথা তো—"

রাধাচরণবাবু বলিলেন,—"রায় বাহাদুর এলে বলো এখন তাই। তাঁকেও অনুরোধ কর না বাণী সিনেমায় যেতে।"

—"চললেন?"

—"চলি। ওবেলা আসব ঠিক সময়ে।"

রায় বাহাদুর স্থানীয় জমিদার নীরেন চাটুয্যের বাড়ীতে বসিয়া সভা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আয়োজন করিতেছিলেন।

নীরেনবাবু রায়বাহাদুরের মাসতুতো ভাই, স্থানীয় জমিদার ও উকিল। উকিল হিসাবে হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু জমিদারির আয় ও পূর্বপুরুষসঞ্চিত অর্থে, রানাঘাটের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। শিক্ষিত লোকও বটে।

রায় বাহাদুর গুরুভোজন করিয়া উঠিয়াছেন মধ্যাহ্নে। ধনী মাসতুতো ভাই-এর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন রীতিমত গুরুতর। দু-একবার নিদ্রাকর্ষণ হইতেও ছিল, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে শুইতে পারেন নাই।

নীরেনবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, বক্তৃতায় মোট কথাটা কি হবে আজকের ?"

—তা ঠিক জানি নে। **On the unity of forces**—এই বিষয়-বস্তু। এ থেকে ধরে নাও।"

—"উনি **Space**-এর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন, কি বলুন ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"**Space** বলেছেন সীমাবদ্ধ। আগেকার মত অসীম অনন্ত **space** আর নেই।"

—"তোমার ম্যাথমেটিক্স ছিল এম-এসসি-তে ? **Geometry of Hyperspaces** পড়েছ।"

—"মিক্সড ম্যাথমেটিক্স ছিল। আপনি যা বলছেন, তা আমি জানি।"

—"খুব খুশি হলুম দেখে নীরেন যে শুধু জমিদারি কর না, জগতের বড় বড় বিষয়ে একটুআধটু সন্ধান রাখ। খুব বেশি সন্ধান হয়তো নয়, তবুও **the very little that you know unknown to many.**"

—"আচ্ছা দাদা, উনি কি আজই চলে যাবেন ?"

—"সম্ভব। দার্জিলিং যাবেন বলছিলেন ; দার্জিলিঙের পথে এখানে নামবেন। যাতে ওঁর দুপয়সা হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

—"আজ সভার পরে আমার বাড়ীতে আনুন না একবার দাদা ? এখানে রাতের জন্যে রাখতেও আমি পারি। আজ দার্জিলিঙের গাড়ী নেই। রাত্রে এখানে থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না।"

—"বেশ, বলব এখন।"

—"যাতে থাকেন তাই করুন। কালই খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট করিয়ে দেব এখন। ফ্রী প্রেসের আর আনন্দবাজারের রিপোর্টার এখানে আছে।"

রায় বাহাদুর বুঝিলেন তাঁর মাসতুতো ভাইটির দরদ কোথায়। সেসব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই, এখন কোন রকমে কার্যসিদ্ধি হইলেই হয়। কোন রকমে আজ মিটিং চুকিলে বাঁচেন।

বাড়ীর ভিতর হইতে নীরেনবাবুর মেয়ে মীনা আসিয়া বলিল,—"ও জ্যাঠামশায়, বাবাকে বলে আমাদের টিকিটের টাকা দিন।"

নীরেনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন,—"যা যা বাড়ীর মধ্যে যা, এখন বিরক্ত করিসনি। ব্যস্ত আছি।"

মীনা আবদারের সুরে বলিল,—"তোমাকে তো বলিনি বাবা, জ্যাঠামশাইকে বলছি।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের টিকিট রে মীনু ?"

মীনা বলিল,—"আপনি কোথায় থাকেন যে সর্বদা। আমাদের পাশের বাড়ীর সবিতা আপনাদের কলেজে পড়ে, সে বলে আপনি নাকি পথ চলতে চলতে অঙ্ক কষেন। সত্যি, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই ?"

নীরেনবাবু পুনরায় ধমকের সুরে বলিলেন,—"আঃ, জ্যাঠা মেয়ে! যা এখান থেকে। জ্বালালে দেখছি। কিসের টিকিট জানেন দাদা, ঐ যে ইন্দুবালা নাকি আজ আসছে আমাদের এখানকার বাণী সিনেমাতে, নাচগান হবে, কি নাকি বক্তৃতাও দেবে, তাই পাড়াসুদ্ধু ভেঙে পড়েছে দেখবার জন্যে। মেয়েরা তো সকাল থেকে জ্বালালে।"

—"তা দাও না ওদের যেতে। আইনস্টাইনের লেকচারে আর ওরা কি যাবে। তবে দেখে রাখলে একথা বলতে পারত সারাজীবন। কি রে মীনু, কোথায় যাবি ?"

—"আমরা জ্যাঠামশাই সিনেমাতেই যাই। 'মিলন' ফিলমে ইন্দুবালাকে দেখে পর্যন্ত বড্ড একটা ইচ্ছে আছে ওকে দেখব। রানাঘাটে অমন লোক আসবে—"

রায় বাহাদুর বাকিটুকু যোগাইয়া বলিলেন,—"স্বপ্নের অগোচর! তাই না মীনু ? টিকিটের দাম দিয়ে দাও মেয়েকে, ওহে নীরেন।"

মীনা এবার সাহস পাইয়া বলিল,—"আপনাকে আর বাবাকে যেতে হবে আমাদের নিয়ে। সে শুনছি নে। বাবার মনে মনে ইচ্ছে আছে জ্যাঠামশায়। শুধু আপনার ভয়ে—"

নীরেনবাবু তাড়া দিয়া বলিলেন,—"তবে রে দুষ্টু মেয়ে—"

মীনা হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"বাবা তোমাকে যেতেই হবে আমাদের নিয়ে। ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।"

দার্জিলিং মেলের সময় হইয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা।

রায় বাহাদুর ও কয়েকজন ছাত্র, নীরেনবাবু ও শ্রীগোপালবাবু স্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—একি?

এত ভিড় কিসের? প্লাটফর্মের চারিদিকে এত ছোকরা ছাত্র, লোকজনের ভিড়! সত্যই কি আজ আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে এখানকার সকলের টনক নড়িয়াছে? ইহারা সকলেই দার্জিলিং মেলের সময় আসিয়াছে তাঁহাকে নামাইয়া লইতে। অত বড় বৈজ্ঞানিকের অভ্যর্থনা বটে! লোকে লোকারণ্য প্লাটফর্ম। হৈ হৈ কাণ্ড। রায় বাহাদুর পুলকিত হইলেন। সশব্দে মেলট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা হইতে ছোট একটি ব্যাগ হাতে দীর্ঘকেশ আয়তচক্ষু আইনস্টাইন অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা হইতে জনৈক সুন্দরী তরুণী, পরনে দামী ভয়েল শাড়ী, পায়ে জরিদার কাশ্মীরী স্যাণ্ডাল—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলাইয়া নামিয়া পড়িলেন। তরুণীর সঙ্গে আরও দুটি তরুণী, দু'টিই শ্যামাঙ্গী—দু'জন চাকর, তারা লগেজ নামাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কে একজন বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে নেমেছেন! ঐ তো ইন্দুবালা দেবী—"

মুহূর্তমধ্যে প্ল্যাটফর্মসুদ্ধ লোক সেদিকে ভাঙিয়া পড়িল। সেই

ভীষণ ভিড়ের মধ্যে রায় বাহাদুর অতিকষ্টে আইনস্টাইনকে লইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আইনস্টাইন অত বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিলেন তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এত লোকের ভিড়। রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরা সবাই কি স্থানীয় ইউনিভারসিটির ছাত্র? এদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না মিঃ মুখার্জ্জি?"

রায় বাহাদুর এই উদার সরলপ্রাণ বিজ্ঞানতপস্বীর ভ্রম ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেন না।

রানাঘাটে আবার ইউনিভার্সিটি! হায় রে, এ দেশ কোন্ দেশ তা ইনি এখনও বুঝিতে পারেন না। সবাই ইউরোপ নয়।

নীরেনবাবু চাহিয়া-চিন্তিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনী গোপাল পালেদের পুরোনো ১৯১৭ সনের মডেলের গাড়ীখানি যোগাড় করিয়াছিলেন! তাহাতেই সকলে মিলিয়া চড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখা গেল তখনও বহুলোক স্টেশনের গেটের দিকে ছুটিতেছে। একজন কে বলিতেছিল,—"গাড়ী অনেকক্ষণ এসেছে, ঐ দেখ লেগে আছে প্ল্যাটফর্মে। শীগগির ছোট।" ভিড়ের মধ্যে কে উত্তর দিলে,—"এখান দিয়েই তো বেরুবেন, আর ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। বড্ড ভিড়। ও তো চেনা মুখ। দেখলেই চেনা যাবে। কত ছবিতে দেখা আছে। সেদিনও 'মিলন' ফিলমে—"

আইনস্টাইন কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন,—"এরাও ছুটছে স্টেশনে বুঝি। ওরা জানে না যাকে দেখতে চলেছে সে তাদের সামনেই গাড়ীতে উঠেছে। বেশ মজা, না? মিঃ মুখার্জি, এখানে ইউনিভার্সিটি কোন্ দিকে?"

সৌভাগ্যক্রমে ভিড়ের মধ্যের একটা লোক আইনস্টাইনের গাড়ীর সামনে আসিয়া চাপা পড়-পড় হওয়াতে হঠাৎ ফুটব্রেক কষার কর্কশ

শব্দের ও 'এই এই' 'গেল গেল' রবের মধ্যে তাঁহার প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। স্টেশন ও ভিড় ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মোড়ের মাথায় শ্রীগোপালবাবু ও নীরেনবাবু নামিয়া গেলেন। রায় বাহাদুর বলিলেন,—"এখুনি আসবেন তো ?"

শ্রীগোপালবাবু কি বলিলেন ভাল বোঝা গেল না। নীরেনবাবু বলিলেন, "ওখানে ওদের পৌঁছে দিয়েই আসছি। আর কেউ বাড়ীতে লোক নেই মেয়েদের নিয়ে যেতে। টিকিটে এতগুলো টাকা যখন গিয়েছে—"

ঐ সামনেই মিউনিসিপ্যাল হল। স্টেশনের কাছেই। কিন্তু এ কি ? সাড়ে পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল। পৌনে ছটা হইয়াছে, কেউ তো আসে নাই। জনপ্রাণী নয়। কেবল মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানী জীবন ভাদুড়ি একটা ছোট টেবিলে অনেকগুলি টিকিট সাজাইয়া শ্রোতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মোটর হলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া নামাইলেন রায় বাহাদুর। মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"হে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ, সুস্বাগতম্। আমাদের রানাঘাটের মাটিতে আপনার পদার্পণের ইতিহাস স্বুবর্ণ অক্ষরে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক—আমরা রানাঘাটবাসীরা আজ ধন্য !"

চকিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভ হলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সঙ্গে সঙ্গে। লোক কই ? রানাঘাটবাসীদের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ কোথায় ?

আইনস্টাইন বিস্মিত দৃষ্টিতে জনশূন্য হলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, —"এখনও আসেনি কেউ ? সব স্টেশনে ভিড় করছে। মিঃ মুখার্জি, একটা ব্ল্যাক-বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে যে। বক্তৃতার সময় ব্ল্যাক-বোর্ডে আঁকবার দরকার হবে।"

আর ব্ল্যাকবোর্ড! রায় বাহাদুর স্থানীয় ব্যক্তি। নাড়ীজ্ঞান আছে এ জায়গার। তিনি শূন্য ও হতাশ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন।

জীবন ভাদুড়ি কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—"মোটে তিন টাকার বিক্রি হয়েছে। তাও টাকা দেয়নি এখন। কি করব বলুন সার? আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে বলুন। আমার আবার বাসার ছেলেমেয়ে-দের নিয়ে বাণী সিনেমায় যেতে হবে। কলকাতা থেকে ইন্দুবালা এসেছেন—বাড়ীতে বড্ড ধরেছে সব। পঁয়ত্রিশ টাকা মোটে মাইনে—তা বলি, থাক গে, কষ্ট তো আছেই। ওঁদের মত লোক তো রোজ কলকাতা থেকে আসবেন না। যাক, পাঁচ টাকা খরচ হলে আর কি করছি বলুন। আমায় একটু ছুটি দিতে হবে সার। এ সাহেব কে? এ সাহেবের লেকচারে আজ লোক হবে না—কে আজ এখানে আসবে সার!"

জীবন ভাদুড়ি ক্যাশ বুঝাইয়া দিয়া খসিয়া পড়িল। হলের মধ্যে দেখা গেল চেয়ার বেঞ্চির জনহীন অরণ্যে মাত্র দুটি প্রাণী—আইন-স্টাইন ও রায় বাহাদুর।

আইনস্টাইন ব্যাগ খুলিয়া কি জিনিস টেবিলের উপর সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন, সেগুলি তাঁহার বক্তৃতার সময় প্রয়োজন হইবে—এই সুযোগে রায় বাহাদুর একবার বাহিরে গিয়া রাস্তার এদিক ওদিক উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিতে লাগিলেন।

লোকজন যাইতেছে, ঘোড়ার গাড়ীতে মেয়েরা সাজগোজ করিয়া চলিয়াছে, দ্রুতপদে পথিকদল ছুটিয়াছে—সব বাণী সিনেমা লক্ষ্য করিয়া।

রায় বাহাদুরের একজন পরিচিত উকিলবাবু ছড়ি হাতে দ্রুতপদে জনসাধারণের অনুসরণ করিতেছিলেন, রায় বাহাদুরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এই যে! সাহেব এসেছেন? লোকজন কেমন হয়েছে ভেতরে? আজ আবার আনফরচুনেটলি ওটার সঙ্গে ক্ল্যাশ করল কিনা?"

অন্যদিন হলে—না, আমার জো নেই—বাড়ীর মেয়েরা সব গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কেউ নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে—কাজেই—"

রায় বাহাদুর মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সাড়ে ছটা। পৌনে সাতটা। সাতটা।

জনপ্রাণী নাই।

বাণী সিনেমা গৃহ লোকে লোকারণ্য। টিকিট কিনিতে না পাইয়া বহু লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। একদল জোর-জবরদস্তি করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার দুই দিকের ব্যালকনির অবস্থা এরূপ যে আশঙ্কা হইতেছে ভাঙিয়া না পড়ে। স্টেজে যবনিকা উঠিয়াছে। চিত্রতারকা ইন্দুবালা সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন—তাঁরই গাওয়া 'মিলন' ছবির কয়েকখানি দেশবিখ্যাত গান, বালক বৃদ্ধ যুবার মুখে মুখে গীত গান—'জংলা হাওয়ায় চমক লাগায়', 'ওরে অচিন দেশের পোষা পাখী', 'রাজার কুমার পক্ষীরাজ' ইত্যাদি।

এমন সময় রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে টকিহলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শ্রীগোপালবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাশেই অদূরে নীরেনবাবু বসিয়া। বলিলেন, —"বা রে, আপনিও এখানে!"

হঠাৎ-ধরাপড়া চোরের মত থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শ্রীগোপালবাবু বলিলেন,—"আসার ইচ্ছে ছিল না, কি করি—মেয়েরা—ওদের আনা—ইয়ে—সাহেবের লেকচার কেমন হল? লোকজন হয়নি?

—"কি করে হবে? আপনারা সবাই এখানে। লোক কে যাবে?"

—"সাহেব কোথায়? চলে গেছেন?"

—"এই যে—"

রায় বাহাদুরের পিছনেই দাঁড়াইয়া স্বয়ং আইনস্টাইন।

শ্রীগোপালবাবু শশব্যস্তে উঠিয়া আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া খাতির করিয়া নিজের চেয়ারে বসাইলেন।

একটি খবরের কাগজের কাটিং রাখিয়াছিলাম। এটি এখানে জানাইয়া দেওয়া গেল—

এখানে আলুর দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধানের দর কিছু কমের দিকে। ম্যালেরিয়া কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সুযোগ্য সাবডিভিসন্যাল অফিসার মহোদয়ের চেষ্টায় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমা গৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সংগীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষত 'কালো বাতুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সংগীত প্রদর্শন করিয়াছেন, রানাঘাটবাসিগণ তাহা কোনদিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমা গৃহে অভূতপূর্ব জনসমাগম হইয়াছিল—সেও একটি দেখিবার মত জিনিস হইয়াছিল বটে। লোকজনের ভিড়ে মেয়েদের ব্যালকনির নীচে বরগা তুমড়াইয়া গিয়াছিল। ঠিক সময়ে ধরা পড়াতে একটি তুর্ঘটনার হাত হইতে সকলে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউনিসিপ্যাল হলে বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

উড়ুম্বর

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস স্বগৃহের বহির্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও-প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালিদাস বাড়ী আছ কি?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন, ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত'খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া ভাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন —সকালে কি করছিলে? গাছের তলায় বসেছিলে দেখলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে, বসে বসে 'মেঘদূত'খানা একবার দেখছিলাম। কাল রাত্রে যে গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায়

বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু'চোখের পাতা কাল বুজতে পারি নি। স্বর্গ আর সে স্বর্গ নেই। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়ে নি আজ দশ-পনেরো দিন। তারপর তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো?

—থাক্, দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে।

—আজ্ঞে, নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্মচারীকে বলে কয়ে একটি চারা আনিয়েছিলাম। তবে এখনো পুষ্প-প্রসবের সময় হয় নি।

—সে কি রকম? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে না কি? এখন তো—

—তা নয়। এ একটু অন্যরকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটু কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'-এর নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, মর্ত্যে নাকি কোন্ প্রেক্ষা-গৃহে দেখানো হচ্চে। এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ, সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেচে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসব দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না?

—নিশ্চয় যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারত-বর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবুও তো তোমার কাব্য সেখানে আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'র কথা তো সবাই ভুলে

গিয়েচে। তোমার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্যও তো হোলো। আমার নাটক কে পড়ে?

—আজকাল বাঙ্ময়-আলেখ্যর যুগ চলেচে ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্যন্ত দুটি বাঙ্ময়-আলেখ্যর প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইঁহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক, তাঁহারও শ্বেত-শ্মশ্রু, তবে ভাসের মত বক্ষদেশালম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্টি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্তা বলেন, ভাস কালিদাসেরও পূর্বাচার্য, সুবন্ধুর মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে, যাবো।

—এখন মর্ত্যে কোনো গোলযোগ নেই তো?

দুইজনই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুরঘুর করিয়া প্রায়ই মর্ত্যধামে যাতায়াত করেন এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্যধামের শৌখিন লীলা-বিলাসের বাসনা এখনও তাহার যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিত সুরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন

আর কে পড়ে ?

—আমার নাটক কে পড়ে ?

—ও-কথা যদি আপনি বলেন তো আমাদের আশাই নেই। আপনারা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্যপাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখচি—

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—আমার কি সৌভাগ্য ! এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন ?

—আপনি দেখচেন দুজনকে। আমি দেখচি তিন দিক্‌পালকে। আমি বিখ্যাত কবি নই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বললেন—ওহে ছোকরা তুমি থাম তো! তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখো। আমি যে জন্যে এসেছি কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোন অসুবিধে হবে না ?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বচ্ছন্দে বল বাবাজী। আমার কি অসুবিধে!

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখছি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করেচে। এখন আমার একটা কথা। শুনলাম, দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য

হয়েচে পৃথিবীতে ?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত'খানার ওইরকম করা যায় না ? কিংবা 'মালতী-মাধবে'র ? সেইজন্যেই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও ক'রে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার বাসবদত্তা কাব্যখানার জন্য তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তার দেহ হাওয়া হয়ে রয়েচে—মর্ত্যধামে তার কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল ? বড অসার কথা বলো ছোকরা।

—আজ্ঞে আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোঢ়ল—

—সে আবার কে ?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন ? আমরা হোলাম কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই কাৎলা—সোঢ়ল কবি ধরেচে তার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য ?

—আজ্ঞে উদয়সুন্দরী-কথা নামে চম্পূ কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিম্বা কালিদাস দাদার—

—থাক্ আমার কথা বাদ দাও, ওঁদের কথা বলতে পারো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যাপ্ত হয়েচে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ পড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে।

হ্যাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমি রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম বড় দুরুচ্চার্য—তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থী। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভাল লেগেছে। যাক সে সব কথা। আজ মর্ত্যধামে আমরা যাচ্চি মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন? আলেখ্য-দর্শনের বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুল। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই দলটি যাত্রা করিলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে একসঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেছেন? একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্চি কালিদাসের মেঘদূতের বাঙ্ময়-আলেখ্য দর্শনে, মর্ত্যে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ পীতবর্ণের পট্টবাস। মাথার চুল সাদা হইলেও কুঞ্চিত, পারিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ। তাঁহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কর্ণিকার পুষ্পের গুঞ্জিকা, বেশ শৌখিন ধরণের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরও বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও!

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বাণভট্টকেও।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতঃপদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্যধামে ঘুরঘুর ক'রে যাওয়ার ফল আর কি। আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান ক'রে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের সুরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বাঙ্ময়-আলেখ্য প্রেক্ষাগৃহে—?

—আজ্ঞে না, আপনার ভ্রম হয়েচে! ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের ক্বাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ ক'রে দেখছিলাম—মর্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্যবাসীদের অলীক বাসনা তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বাঙ্ময়-আলেখ্য। মর্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বাঙ্ময়-আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেছি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন? কেন?

—আচার্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাই নে। আর কথায় কথায় গীত। নাঃ, আমি তো দুঃখে আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে, আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাই নি দাদা। কালিদাস দাদাই আমাকে বললেন, উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্চেন। বরং আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না। আমি ওকে যেতে বলেচি। দেখেই আসি কেমন হোলো মেঘদূত। চললাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতায় 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে।

ভিড় খুব। ডিম ভাজা ও ঘুঘ্‌নি, চানাচুর, বাদাম ভাজা, আলু-কাবলি-ওয়ালাদের পাশ কাটাইয়া কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—এ কি ? এ কার মেঘদূত ? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাই তো। আমিও তাই ভাবচি।

—ভবভূতি বলিলেন শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এ এখানে বসে দেখে কি করবো। বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন—ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের ক্বাথ সেবন করবে নাকি ?

—আজ্ঞে না, চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—'মেঘদূত' কার লেখা বই হে ?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন ঘোষের।

—'ভাবীকাল' ?

—তা জানি নে। বই উঠেচে জানিস ?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভাবীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কিনা।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। ভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন—শুনেচেন এ অর্বাচীন বালক দুটি কি বলচে ? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা নাকি এই বই। বাঙ্ময়-আলেখ্যই

প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি ?

সুবন্ধু বলিলেন, এই বাঙ্ময়-আলেখ্যের নির্মাণকার হোলো অতীন ঘোষ নামক কোন লোক। ওরা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেছে গ্রন্থকর্তা। মহাস্থবির অশ্বঘোষের নাম করলেও কালিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ !

সুবন্ধু হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের ? বৃক্ষপত্রের ক্বাথ পান না করেই এই। চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের ক্বাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ ক'রে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোন কথা বোলো না, আমার উত্তররামচরিতের বাঙ্ময়-আলেখ্যে কোন প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা, বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কালিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর বাসবদত্তার এক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করে নি—সেই সুধাংশু রায়কে ও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা। আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে—আপনাদের কি ?

ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া

বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদীমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গম্ভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন, আমার গৃহ পবিত্র হোলো আপনার চরণ-স্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ ?

ব্যাসদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল ? ভাস, তুমি ভাল আছ ? বোস, বোস। কোথায় গিয়েছিলে ? মর্ত্যধামে ? ভবভূতিও সঙ্গে ছিল ? ছোকরা ভাল লেখে। সেখানে কেন ?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও ঐ কারণেই এসেছিলাম, গীতার একটি বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণ করিয়ে দিতে পারো ? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি ; তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো আজকালকার ছেলে, মর্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো ?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলঙ্ককারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা ?

পরে ব্যাসদেব সব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আপনাকে আমি কি বলবো ?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, তার নামটি কি বললে ? মেঘদূত ? কি অবলম্বনে লেখা ? কাব্যের

ঘটনাটি কি ?

কালিদাস লজ্জিত সুরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই, তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনার মত। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝ ব্যাপার !

জওহরলাল ও গড্
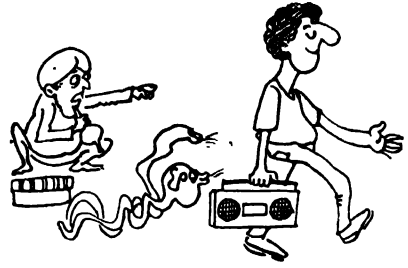
সেদিন হাওড়া স্টেশনে সকাল হইতেই ভিড় হইবে এই রকম একটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় করিয়া খবর বাহির হইয়াছিল জওহরলালজি সেদিন বম্বে মেলে কলিকাতায় আসিতেছেন। আরও একটি খবর বাহির হইয়াছিল, ভগবান স্বয়ং পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা আসিতেছেন, হিমালয়ের কোন একটা স্থান হইতে।

এই পর্যন্ত। টাইম টেবিল দেখিয়া জানিলাম উভয় ট্রেন আসিয়া পোঁছিবে দু'ঘণ্টার ব্যবধানে। বম্বে মেল আগে আসিবে, বেলা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে।

গিয়া দেখি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্ট্র্যাণ্ড রোডের পর হাওড়া পুলের দিকে এক পা-ও বাড়ানো সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবিলাম; ভগবান ও জওহরলাল একই দিনে যখন কলিকাতা আসিতেছেন, তখন এমন ভিড় হওয়া স্বাভাবিক বটে।

জওহরলালজি আসিবার কথায় তত বিস্মিত হই নাই, কারণ তিনি ইতিপূর্বেও কলিকাতায় আসিয়াছেন। কিন্তু ভগবান কখনও কোথাও আসেন না, তিনি নিরাকার, এ পর্যন্ত তাঁহাকে কেহ দেখে নাই বলিয়াই শুনিয়াছি। তিনি হঠাৎ অদ্য পাঞ্জাব মেলে কেন যে কলিকাতা আসিতেছেন, কিছু বোঝা গেল না। কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহাও জানি না।

ভিড়ের মধ্যে দেখি একদল সংকীর্তন পার্টি চলিয়াছে, বোধ হয় ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সংকীর্তন পার্টি কি হইবে? কারো গঙ্গাযাত্রার সময় সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয় জানি, কিন্তু ভগবান যখন স্বয়ং হাওড়া স্টেশনে আসিয়াছেন, তখন এর অপেক্ষা ভালো ব্যবস্থা কি করা যাইত না?

অতি কষ্টে প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখভাগে আগাইবার চেষ্টা করিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালজির ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহার পর স্টেশন ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি, বহুবিধ স্লোগানের সমবেত উচ্চকণ্ঠের উচ্চারণে। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের দল দেখিতে দেখিতে পণ্ডিতজিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর সেই বিরাট জনতা তাঁহাকে লইয়া পথে নামিল এই পর্যন্ত দেখিলাম—ইহার পর কি ঘটিল না ঘটিল বলিতে পারিব না, কারণ আমি জওহরলালজির সে বিশাল শোভাযাত্রায় যোগদান করি নাই, ভগবানকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মেই ছিলাম।

দল চলিয়া গেল।

প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি।

সেই সংকীর্তন পার্টি ছাড়া ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কেহই উপস্থিত নাই গোটা প্ল্যাটফর্মে। একজন রোগা, গোঁফদাড়িকামানো লোক আমার কাছে আসিয়া বলিল—মশায়, আজ নাকি ভগবান আসচেন?

—এই রকমই তো কাগজে লিখেচে।

—কোন্ প্ল্যাটফর্মে জানেন?

—পাঞ্জাব মেলে তো আসছেন। এন্‌কোয়ারি অফিসে একবার জিজ্ঞেস করে আসুন না?

—উঃ মশাই, যা ভিড়ের কাণ্ড! কি কষ্টে যে হাওড়া পুলটুকু

ছাড়িয়ে এসেচি !

—প্রসেশন কতদূর গেল ?

—জওহরলালজির মোটর তো স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাইকোর্ট-মুখো চলে গেল দেখলাম—আর কিছু বলতে পারি নে। বসুন, এন্‌কোয়ারি আপিসে জিজ্ঞেস করে আসি।

লোকটা সেই যে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অন্তত আমি আর তাহাকে দেখিলাম না।

মিনিট কুড়ি পরে পাঞ্জাব মেল আসিয়া সশব্দে স্টেশনে প্রবেশ করিল। বিশেষ কোনো দলকে আগাইয়া যাইতে দেখিলাম না, সেই ক্ষুদ্র সংকীর্তন পার্টি ছাড়া, তাহারা ততক্ষণ খোল ও খঞ্জনীর সাহায্যে উদ্দণ্ড রেঢ়ো কীর্তন জুড়িয়া দিয়াছে।

প্ল্যাটফর্মময় ফুল ও ছেঁড়া ফুলের মালা ছড়ানো। কিছুক্ষণ পূর্বে পণ্ডিতজির উদ্দেশে যে বিরাট পুষ্পবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহারই চিহ্ন। একগাছা মালা কেন সংগ্রহ করিয়া আনিলাম না ভগবানের জন্য, ভাবিয়া মায়া হইল সে বেচারীর উপর। সংকীর্তনের দল কি মালা আনিয়াছে ? আনিতে পারে।

হুড়হুড় করিয়া লোক নামিয়া গাড়ী খালি হইয়া আসিল। বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, পাঠান যাত্রীর দল নিজের নিজের জিনিসপত্র কুলীর মাথায় চাপাইয়া, ব্যাগ ও টিফিন-ক্যারিয়ার নিজের নিজের হাতে ঝুলাইয়া গেটের দিকে চলিয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকার বাক্স ও হোল্ড-অল-বাঁধা বিছানাকে কেন্দ্র করিয়া মেয়েরা বালক-বালিকাসহ দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্গের পুরুষেরা কুলীদের সঙ্গে দরদস্তুর করিতেছে। খুব একটা ব্যস্তত্রস্ততার ভাব চারিদিকে।

কিন্তু—ভগবান কই ?

ফার্স্ট ক্লাস দেখিলাম, সেকেণ্ড ক্লাস দেখিলাম। দুই তিনটি বাঙালী পরিবার একটি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরা হইতে নামিয়া কামরার

সামনেই মালপত্র নামাইয়া জটলা করিতেছে। এঞ্জিনের সামনে ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাস কম্পোজিট বগিখানিতে মিলিটারী বোঝাই। তাদের সঙ্গে বহু মালপত্র। কুলীরা ঠেলাগাড়ী আনিয়া মাল বোঝাই করিতেছে! এখানেও তো ভগবানের আসিবার কথা নহে।

সংকীর্তন পার্টি কীর্তন থামাইয়াছে। তাহাদের কাছে গিয়া বলিলাম—মশায়, ভগবানকে খুঁজে পেলেন?

উহাদের একজন বলিল—না মশায়, আমরাও তো খুঁজচি।

—পেছন দিকটা দেখে এসেচেন?

—সব দিকে দেখা হয়ে গিয়েচে।

—ইণ্টার ক্লাসটা দেখা হয়েচে?

—কোনো ক্লাসই বাদ দিই নি আমরা। কোথাও তো তেমন কোনো লোককে দেখলাম না মশাই। আমরা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ থেকে আসচি।

আরও খানিকটা অপেক্ষা করিবার পর আমি নিরাশ মনে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলাম। কি মনে করিয়া ট্রাম না ধরিয়া হাওড়া পুল ধরিয়াই চলিয়াছি, হঠাৎ চোখে পড়িল একজন লোক পুলের মাঝামাঝি রেলিং ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া আছে।

আমি পাশ দিয়া যাইতেছি, লোকটি হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। লোকটির চেহারায় কি যেন ছিল, দীন-দুঃখীর মত অকিঞ্চন ভাব মুখে, অথচ চোখ-দুটিতে অতলস্পর্শ গভীরতা ও বালকোচিত সারল্য একসঙ্গে মাখানো। আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম ওর এই মুখ-ভাবের আশ্চর্য পবিত্রতা ও সরলতায়। বলিলাম—কোথায় যাবেন?

লোকটি গঙ্গার দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই নতুন পুল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—বেশ পুল করেচে। সাহেবেরা করে ভালো।

—আপনি কোথায় যাবেন? অনেকদিন আসেন নি বুঝি কলকাতায়?

—আমি ভগবান। কলকাতায় এসেচি এই ট্রেনে। হাওড়া স্টেশনে কেউ তো আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে যায় নি?

কি সর্বনাশ, লোকটা বলে কি। ভগবান? এই লোকটা? এ'কে তো নিতান্ত অভাজন বলিয়া মনে হইতেছিল—যদিও কি গুণে লোকটা মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে বটে।

আমি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলাম। বলিলাম—আপনি?

—হ্যাঁ। বলি ওরা আমাকে কেউ স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এলো না কেন?

—ওরা জওহরলালজিকে এগিয়ে নিয়ে গেল কিনা—তাই—

—আর আমার বেলা কেউ বুঝি এলো না?

ভদ্রলোক দেখিলাম ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের সুরে কথা কয়টি বলিলেন। আমার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। ভগবান এত ছেলেমানুষ!

সান্ত্বনার সুরে বলিলাম—তা কেন, গৌড়ীয় মঠের বাবাজিরা কীর্তন পার্টি নিয়ে এসেছিলেন তো? তা বোধ হয় আপনাকে তাঁরা চিনতে পারেন নি। আপনার কোনো ফটো তো ইতিপূর্বে কোনো খবরের কাগজে বার হয় নি, চেনাই যে দায়।

ভগবান আমার কথায় ছেলেমানুষের মতন অল্পে সান্ত্বনা পাইয়া বলিলেন—তা বটে। চিনতে পারে নি তা কি করবে। শোনো, আমার একটা ফটো তুলিয়ে খবরের কাগজে ছেপে দিতে পারবে?

—আজ্ঞে বলেন—আজ্ঞে আমি—ফটো, আমি তুলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কোনো খবরের কাগজের লোকের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। কাগজে ফটো ছাপাবার ব্যবস্থা তো করতে পারিনে—

ভগবান নিরাশ ভাবে বলিলেন—ও!

আমার আবার মায়া হইল। তাঁর এই অসহায় বালকের মত কণ্ঠের 'ও!' শুনিয়া বলিলাম—চলুন না কেন, এই কাছেই বর্মন স্ট্রীটে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে, ওরা আপনার ফটো নিশ্চয়ই যত্ন করে ছাপবে আপনার নাম শুনলে—চলুন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চি—

ভগবানের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। আগ্রহের সুরে বলিলেন —চলো, চলো—তাই চলো—এইবার ফটো ছাপালে সামনের বারে অনেক লোক আসবে।

তারপর যেন খানিকটা আপন মনেই বলিলেন—লোকে চেনে না তাই, না চিনলে—

আমি কিন্তু যে কথাটা ভাবিতেছিলাম, সেটা তাঁহাকে বলিলাম না। ফটো ছাপানো হয় না বলিয়া চিনিবার অসুবিধার জন্য যে তাঁহার অভ্যর্থনা হয় নাই তাহা তো কথা নয়, আসলে প্ল্যাটফর্মে তখন লোকজনই ছিল না তিনি যে সময় আসিলেন।

হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়াতে কথাটা বলিলাম যে তিনি কোথায় উঠিবেন, ঠিক করিয়াছেন?

তিনি বলিলেন—কেউ তো আগ্রহ করে নিয়ে যাচ্চে না, কোথায় উঠবো কি জানি!

—যদি কিছু মনে না করেন, আমার একখানা ঘর আছে দোতলায়। ভাড়াটে ঘর, একলাই থাকি। সেখানেই যদি আজ রাত্রে থাকেন—

—তা বেশ। যাবো এখন।

—আপনার খাওয়া-দাওয়া তো কোনো—মানে ওখানে সব আঁষ, মাছ-মাংস খাই। অবিশ্যি নিরামিষ যদি খান, তবে তার ব্যবস্থা করে দেবো এখন।

ভগবান হাসিয়া বলিলেন—আমার আবার ওসব কি? যা দেবে,

তাই খাবো। আমি কি বোষ্টম গোসাঁই?

অপ্রতিভ সুরে বলিলাম—আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন। বৈষ্ণবেরা নিরামিষ ভোগ আপনাকে নিবেদন করে দেন কিনা তাই বলছিলাম—

—আবার অন্যলোকে মাছ-মাংস দিয়ে ভোগ দেয়—মুরগি বলি দেয়, গরু মহিষ ছাগল কাটে—তাও খাই। আমার এক অবতারে আমি ভক্তের দেওয়া শূকরের মাংস খেয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে নরদেহ ত্যাগ করি।

—আজ্ঞে জানি, বুদ্ধ অবতারে।

—ব্যাপার কি জানো, আদিম নীহারিকাটা ঘুরিয়ে দেবার পরে বিশ্বসৃষ্টি আপনা-আপনি হচ্চে, আমার কোনো কাজ নেই। আজ কোটি কোটি বৎসর ধ'রে বেকার বসে আছি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কোথায় কি হচ্চে দেখি। এখন আমি শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র। জগতে দেখতে পাই আমায় কেউ চায় না, কেউ বোঝে না—একা একা থাকি। সর্বত্রই আছি অথচ কেউ ফিরে চেয়েও দেখে না। কেউ মানে না আজকাল আর, বলে উনি তো বেকার। জগৎ আপনা-আপনিই চলচে, ওঁর আবশ্যকতা বা কি?

কষ্ট হইল বেচারীর জন্য। এমন সুরে কথা বলিলেন, তাঁর উপর কেমন একটা মায়াও হইল।

মানুষ বেকার হইত, চেষ্টা যত্ন করিয়া একটা কাজ জোগাড় করিয়া দিতাম। ভগবানের বেকার-সমস্যার সমাধান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

সামনেই চিৎপুর রোড। বড় ট্রাফিকের ভিড়।

পিছনে ফিরিয়া বলিলাম—আসুন, এই সামনেই 'আনন্দবাজার আপিস'—আপনার ফটোটা তাহলে—

আহ্লাদের সুরে বলিলেন—বেশ, চলো চলো—ওদের আমার পরিচয়টা দিয়ে দিও—

নাঃ, বড্ড সরল ও ছেলেমানুষের মত। এত ছেলেমানুষি কেন ভগবানের মধ্যে ? আহা, কেন লোকে ওঁকে মানে না, গ্রাহ্য করে না, না মানিয়া মনে কষ্ট দেয় !

চিৎপুর রোড পার হইয়া ওপারের ফুটপাথে উঠিয়া পিছন ফিরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া দেখি, তিনি নাই। ভিড়ের মধ্যে কোথাও হারাইয়া গেলেন নাকি ? কলিকাতায় চলাফেরা অভ্যাস নাই তো !

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন, না অভিমান করিয়া আবার তাঁহার স্বধামেই ফিরিয়া গেলেন—কি করিয়া বলিব।

মূলো—র‍্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ
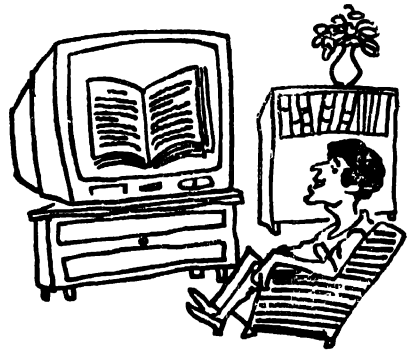
নবীনবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া কয়লা চাকরকে ডাকাডাকি করিতেছেন শুনিতে পাইয়াও আবার মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া এবং তার একটু পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াও পড়িয়াছি। জানালার ফাঁক দিয়া পাশের আতাগাছের ডাল যখন দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি রোদের মধ্যে ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তখন কয়লার ডাকে তন্দ্রা ভাঙিল।

—বাবুজি, চা তৈয়ার!

—চা? এখানে নিয়ে আয়, বিছানায়।

নবীনবাবু বোধ হয় প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া আমার ঘরের পাশের সরু করিডোর দিয়া গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেলেন আমার আলস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বেশ জোরে জোরে পা ফেলিয়া গেলেন! চা-পান বিছানায় বসিয়াই শেষ করিয়া উঠিব উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় নবীনবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার বিছানার পাশের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—উঠুন মশাই, যোধপুরী মূলো এসেছে, র‍্যাডিশ।

আমি চটি পায়ে দিতে দিতে বলিলাম—হর্স র‍্যাডিশ। একা, না মিস সোরাবজিকে নিয়ে?

নবীনবাবু রাগ করিয়া বলিলেন—আসুন না, উঠেই আসুন না।

মিস সোরাবজির বাবা-মার দায় পড়েছে ওর সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে সকাল বেলা। একাই এসেছে।

পরে পিছন ফিরিয়া বলিলেন—আচ্ছা, রোজ রোজ কেন সকালে এসে জোটে বলুন তো? কি কাজ এখানে বাপু তোর? বিরক্ত করলে! আর আপনিও আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবেন না একদিনও—

বলিলাম—আপনার উক্তি দুটির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটা কি ভাল বুঝলাম না নবীনদা—

—বুঝবেন বুঝবেন—শীগগিরই বুঝবেন। যদি সকালে সকালে বেরিয়ে যাই, তাহলে তো আর এ হাঙ্গামা এসে জোটে না সকাল-বেলা। এখন চা কর রে, খাওয়াও রে, ভ্যাজ ভ্যাজ করে বকো রে—

—নবীনবাবু, শিওরলি ইউ ডোণ্ট গ্রাজ ইওর গেস্ট এ কাপ অব টি।

—থাক থাক হয়েছে—গেস্ট! ভারি আমার গেস্ট রে!

যাহার অভ্যর্থনার আয়োজন এত হৃদ্যতাপূর্ণ, সে বেচারী নির্বিকার ভাবে হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমায় দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া পরম বন্ধুত্বের সুরে বলিল—গুডমর্নিং মিস্টার রায়!

আমি হাত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে পরিপূর্ণ অমায়িকতার সঙ্গে বলিলাম—গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম মিঃ শুকরাম—গুডমর্নিং।

নবীনবাবু উদাসীনভাবে অতিথির করমর্দন করিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, বসুন মিঃ শুকরাম। আমি একবার জেনারেল পোস্টাপিস থেকে একটা তার করে আসি, আপনি ততক্ষণ চা খান।

আমার দিকে চাহিয়া বাংলায় বলিলেন—মূলোকে শীগ্‌গির ভাগাবার চেষ্টা করুন। আজ এখুনি আমাদের বেরুতে হবে, কাজ আছে অনেক।

মূলো যাহাকে বলা হইয়াছে সে বাংলার একবর্ণও বোঝে না তাই রক্ষা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজিতেই হয়।

মূলো জাঁকিয়া বসিয়া আমায় বলিল—বাঙালীদের মত লুচি করে খাওয়াচ্ছেন মিঃ রায়? ও আমার বড় ভাল লাগে। আমি বাঙালীদের সঙ্গে একবার মিশেছিলাম—লুচি খাইয়েছিল। সে এখনও ভুলিনি।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম—নবীনদার পিত্তি জ্বলে যেত—যদি কথাটা শুনত। ভাগ্যিস নেই এখানে। যে অভ্যর্থনার ঘটা তাঁর! কয়লা চাকরকে ডাকিয়া খানকতক লুচি ভাজিতে বলিতে গিয়া শুনিলাম ঘি ও ময়দা বাজার হইতে না আনিলে চলিবে না, ফুরাইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম অতিথির অদৃষ্টে লুচি নাই। নবীনবাবু হয়তো ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িতে পারেন। দরকার নাই সেসব হাঙ্গামায়। চা ও টোস্ট খাওয়াইয়া দিলাম মূলোকে। মূলো তাহার স্বভাব-সিদ্ধভাবে বকিতে শুরু করিয়া দিল। বকুনি আর থামায় না, বেলা নটা বাজিয়া গেল, তবুও তাহার হুঁশ নাই। ইতিমধ্যে নবীনবাবু আসিয়া পড়িলেন, মূলোকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—মূলোটা এখনও যায়নি? হর্স র‍্যাডিশটা?

—না গেলে তো তাড়িয়ে দিতে পারি নে! ও বলছে আমাদের সঙ্গে খিন্‌সি লেক দেখতে যাবে।

—মাটি করেছে! সারলে দেখছি।

মূলো আমাদের কথাবার্তা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মিঃ রায়, খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে কি বলছেন?

নবীনবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে—খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করছি ওর সঙ্গে। আপনি আসবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?

—নিশ্চয় মিঃ বোস, খুব খুশীর সঙ্গে।

—বেশ বেশ। বড় আনন্দ হোল। বড় খুশী হোলাম।

আমি বলিলাম—মিঃ শুকরামের মত সঙ্গী পেলে তো খিন্‌সি তো খিন্‌সি, উত্তর মেরুতে গিয়েও সুখ আছে।

নবীনবাবু ইংরেজিতে সায়সূচক কথা বলিয়া আমায় বাংলাতে বলিলেন—স্বর্গেও যদি যাও মূলোকে নিয়ে স্বর্গের হাওয়া পর্যন্ত তেতো হয়ে উঠবে, ওকে ভাগাবার চেষ্টা কর।

মূলো বলিল—তাহলে কখন রওনা হব আমরা, মিঃ বোস?

—রওনা? সে তো এখনও ঠিক হয়নি, দেখি—

—যদি বলেন আমার এক জানাশোনা গাড়ী আছে—পেট্রোলের খরচা দিলেই রাজী হয়ে যাবে। বলব তাকে?

—বলুন না, বেশ বেশ!

আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

পরদিন মূলোর চেষ্টাতে গাড়ীর জোগাড় হইয়া গেল। আহারাদি সারিয়া আমরা তিনজনে শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী খিন্‌সি হ্রদ দেখিতে রওনা হইলাম। নাগপুর জব্বলপুর রোডের যে স্থান হইতে খিন্‌সি হ্রদের রাস্তা বাহির হইল, ঠিক সেই জায়গাটিতে পড়ে মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি।

মূলো আমাদের সঙ্গে আসিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়া উঠিয়াছে এবং ভীষণ বকুনি শুরু করিয়াছে। নবীনবাবু বাংলায় বলিলেন—মূলোটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে হে! ওকে ওই ম্যাঙ্গানিজের মাইনে রেখে গেলে কেমন হয়?

মূলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস?

তাহার সব বাংলা কথার মানে জানা চাই।

নবীনবাবু উত্তর দিলেন—এই ম্যাঙ্গানিজ খনিটা ইণ্ডিয়ার মধ্যে একটা বড় খনি তাই বলছি।

নাগপুরে আমরা দুজনে আসিয়াছি বেড়াইতেও বটে, কিছু ইনসিওরের আসামী যোগাড় করিতেও বটে। সিভিল লাইনে কোতোয়াল সাহেবের বাংলো ভাড়া লইয়া যেদিনটা বারান্দায় ক্যানভাসের আরাম-কেদারা

পাতিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছি—সেদিন এবং সেই মুহূর্তে এই লোকটি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছে। একটি তরুণ যুবককে বাড়ীর হাতায় ঢুকিতে দেখিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলাম এবং ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাকে চান?

যুবকটির চেহারা একহারা, দাঁত উঁচু, শ্যামবর্ণ, মুখে দুই একটা বসন্তের দাগ, ছোট ছোট চোখ, পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। সে একগাল হাসিয়া বলিল—আপনারা এই বাসা ভাড়া নিয়েছেন? বাঙালী? সে আমি দেখেই বুঝেছি। সেইজন্যই এলাম—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেক দিন থেকে আছে।

বলিলাম—আসুন বসুন। এইখানেই বাড়ী বুঝি?

যুবক পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—দেশ আমার যোধপুর। এখানে কলেজে পড়ি—ফোর্থ ইয়ারে।

—বেশ বেশ। একটু চা খান—

সেই হইতে ইহার যাতায়াত শুরু এমন একটি দিন যায় নাই, যেদিন ছোকরা দুবেলা আসে নাই এবং নানাপ্রকার আলোচনার অবতারণা করে নাই। দিন কয়েক পরেই নবীনবাবু এবং আমি আবিষ্কার করিলাম যে ছোকরা কিছু স্থূলবুদ্ধি, ঠিক সকালে ও বিকেলে চা পানের আগে আসিয়া জুটিবে এবং দুপুর পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া শুধু বকিবে—উঠিবার নামটি করিবে না। বাধ্য হইয়া প্রায়ই দুপুর রাত্রে—কোন কোন দিন দুবেলাই তাহাকে খাইতে বলিতে হইয়াছে। সে খাইয়াছেও। এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিতে পারে না।

হয়তো নবীনবাবু বলিলেন—মিঃ শুকরাম (তাহার নাম রত্নাকর শুকরাম জৈন), ওবেলা আমরা একটু হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাব, বিকেলটাতে থাকব না।

—বেশ বেশ, আমি সন্ধ্যের পর আসব।

—ও তা বেশ। তবে বোধ হয় ফিরতে একটু দেরিও হবে।

না হয় আমি একটু রাত করেই আসব এখন। আপনারা অনেক উঁচু বিষয়ে কথাবার্তা বলেন—আমার শুনতে বড় ভাল লাগে। এই জন্যেই আমি বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে বড় ভালবাসি। তা এখানে বাঙালী বেশি নেই—যাঁরা আছেন, তাঁরা বড় মেশেন না।

এই ধরনের নিবুর্দ্ধিতার পরিচয় দেওয়ার দরুন আমরা তাহাকে 'মূলো' আখ্যা দিলাম এবং তাহার সাক্ষাতে পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বাংলায় তাহাকে 'মূলো' বলিয়া উল্লেখ করিতাম। কখনও কখনও 'মূলো'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া তাহার সামনেই তাহাকে 'র‍্যাডিশ', কখনও 'হর্স র‍্যাডিশ' বলিতাম। বেচারা আমাদের বাংলা কথার অর্থ একবর্ণও বুঝিত না। 'মূলো' কথার ইডিয়মগত অর্থই বা বুঝিবে কিরূপে। মাঝে মাঝে আমাদের মুখে 'র‍্যাডিশ', 'হর্স র‍্যাডিশ' শুনিয়াও কিছু না বুঝিয়া হয়তো ভাবিত—ইহারা এ তিনটা কথা এত ব্যবহার করে কেন?

আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বটে, কিন্তু 'মূলো'র বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বিশেষ নয়, একজন ভাল বাঙালী ম্যাট্রিক ছাত্র তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু জানে। বলা বাহুল্য অবাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে ধারণা স্বভাবত খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়? রামোঃ, এখানে মানুষ আছে কে?

আমাদের এই মনোভাবের পটভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মূলোর ন্যায় একজন স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের যে দুর্দশা এরূপ দাঁড়াইবে আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে ইহা আর বেশি কথা কি?

মজার ব্যাপার এই, যাহাকে লইয়া এই ব্যাপার সে কিছুই বুঝিত না। বরং ভাবিত, আমাদের মত অমায়িক বাঙালী ভদ্রলোকদের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে লাভবান হইয়াছে। এজন্য সে মাঝে মাঝে গর্বও করিত।

মূলোর মুখে শুনেছিলাম ম্যাঙ্গানিজ খনির ম্যানেজারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। গাড়ী জব্বলপুর রোডের উপর খনির সামনে দাঁড়াইতেই সে দোর খুলিয়া ছুটিয়া গেল ম্যানেজারকে খবর দিতে। যেন আমরা লাটসাহেব আসিয়াছি মানসারের ম্যাঙ্গানিজ খনি দর্শন করিতে—এমনভাবে সে হন্তদন্ত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। ইনি মিঃ বোস, ইনি মিঃ রায়—বাঙালী, খুব পণ্ডিত লোক এঁরা দুজনেই। আমার বিশেষ বন্ধু।

কি মুশকিল! পাণ্ডিত্যের মধ্যে তো আমরা করি ইন্সিওরেন্সের দালালি! অবশ্য আমাদের প্রাচীন কীর্তি ও পুরাতত্ত্বের ওপর কিছু ঝোঁক আছে—কিন্তু সে ফটোগ্রাফির দিক হইতে, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দিক হইতে নয়।

মূলোর কাণ্ড দেখিয়া আমরা মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলাম।

ম্যানেজার নাগপুরের লোক, ছিন্দাওয়ারা জেলার অধিবাসী, বেশ ইংরেজি বলে। জব্বলপুর রোডে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমরা প্রায় দু'শ ফুট চড়াই ভাঙিয়া খনির মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। একটা ক্ষুদ্র ডন্‌কি এঞ্জিনে খাদের জল তুলিয়া লম্বা রবার ও তারের নল দিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে ছোটখাটো একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—সেটা দেখিয়া আমরা সকলে খুশী হইলাম।

ম্যানেজার আমাদের চা পান করিতে বলিলে আমরা অস্বীকার করিয়া আবার নীচে নামিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। ম্যানেজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম, কষ্ট করিয়া আমাদের সব দেখাইবার জন্য। গাড়ী পুনরায় চলিল।

নবীনদা কহিলেন—মূলো বড্ড গণ্ডগোল করে। আমাদের নিয়ে

এমন করছিল…।

মূলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস ?

তাহার আবার সকল কথারই মানে জানা চাই।

নবীনদা বলিলেন—চমৎকার খনিটা, তাই বলছিলাম।

—ও, তা র‍্যাডিশের কথা কি বলছিলেন ? এখানে তো র‍্যাডিশ পাওয়া যায় না !

আমরা দুজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। নবীনদা বলিলেন, —ওটা একটা বাংলা ইডিয়ম মিঃ শুকরাম। ভাল জিনিসকে বাংলায় আমরা মূলো বলি।

—তাই নাকি ? হাউ ইণ্টারেস্টিং !

আমি বাংলায় বলিলাম,—তোমার মুণ্ডু—বোকারাম কোথাকার !

নবীনদা বলিলেন—মূলো আর সাধে বলে ! একেবারে হর্স র‍্যাডিশ !

রামটেকের পাহাড় বাঁদিকে রাখিয়া কিছু দূর গিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের নিবিড় ছায়াভরা বীথিপথে চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া মোটর অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতেছে। শরৎ-অপরাহ্ণের অপূর্ব শোভা বনতলে। কোথায় যেন পাকা আতার গন্ধ, দু-একটা বনফুলের সুবাসের সঙ্গে শেফালির পরিচিত সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসের ঝাপ্‌টায়। এমন শোভার মধ্যে বসিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য ইন্সিওরেন্সের দালাল বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

খিন্‌সি হ্রদে উঠিবার সময় পাহাড়ের পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ। অনেক দূর উঠিয়া গেলে শৈলবেষ্টিত হ্রদের শান্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দিকের শৈলসানু ঘন বনে সমাকীর্ণ, স্থানটা নিতান্ত নির্জন। একদিকে অপরাহ্ণের ছায়া, অপর পারের পাহাড়ের গায়ে হলুদ রঙের রোদ। হ্রদের এপারের ডাকবাংলোয় গিয়া আমরা চৌকিদারকে ডাকিয়া চেয়ার বাহির করাইয়া বসিলাম। চৌকিদার আমাদের নির্দেশমত

চায়ের জল চড়াইতে ছুটিল।

নবীনদা ও আমি হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্য নামিলাম। বনের মধ্যকার সরু পথ ধরিয়া ধরিয়া কতদূর নামিয়া গেলাম দুজনে। মূলো এসব ভালবাসে না, সে ডাকবাংলোর বারান্দাতে বসিয়াই রহিল। জলের উপর বুনো শিউলি ফুলের রাশি সকালের রোদে ঝরিয়া পড়িয়াছে—দু তিন দিনের জমানো ফুলের রাশি। আমরা জলের ঢেউ দিয়া একপাশে সরাইয়া স্নান করিলাম।

নবীনদা বলিলেন,—বাঘ নেই তো? বড্ড জঙ্গল চারিধারে—

—আশ্চর্য নয় কিছু।

—মূলোটাকে বাঘে না নিয়ে যায়। একা বসে আছে—

—কেন ড্রাইভার?

—ও চৌকিদারের সঙ্গে গিয়েছে। বলে গেল ফিরতে আধঘণ্টা দেরী হবে, দুধ আনতে গেল। ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া দেখি মূলো নির্বিকার-চিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছে। নাগপুর হইতে আনা বম্বে ক্রনিক্‌ল্‌, আগের তারিখের। আমাদের দেখিয়া বলিল—আমেদাবাদের দুটো মিলে স্ট্রাইক হয়েছে বড় জোর—

নবীনদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—মূলোর কাণ্ড শোন—এমন একটা জায়গায় এসে ওর এখন আমেদাবাদের মিলের কথা বড্ড দরকারী হোল!

কিছুক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ড্রাইভার তাড়াতাড়ি করিতে বলিল। পাহাড়ের পথ, তাহার গাড়ীর আলোটা ভাল নাই—আমরা দেরি করিলে শেষে মুশকিলে পড়িতে হইবে।

মূলো বলিল—চলুন মিঃ বোস। আজ যাওয়া যাক, আর কি দেখবেন, দেখা তো হয়ে গেল—

নবীনদা বলিলেন—তোর মুণ্ডু হোল, হতভাগা হর্স র‍্যাডিশ!

মূলো বলিল—কি?

—মানে, আমাদের এখন যাওয়াই দরকার তাই বলছি।

—হোয়াট হ্যাজ হর্স র‍্যাডিশ টু ডু উইথ ইট ?

—বাংলা ইডিয়ম—ওর মানে মূলো খেতে যেমন ঝাল, অথচ দেখতে রাঙা তেমনি এ জায়গা যতই ভাল হোক—মানে—এই গিয়ে—

আমি নবীনদার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—ঠাণ্ডা লাগতে পারে তাই তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত—বাংলা ইডিয়ম। মূলো হাসিতে লাগিল। বলিল—ফ্যানি, ত্থাট র‍্যাডিশ ইজ অলওয়েজ মিক্সড্ উইথ ইওর বেঙ্গলি ইডিয়ম্‌স্।

খিন্‌সি হ্রদের পাহাড় হইতে নামিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের কুসুমাস্তৃত পথে আমরা রামটেক পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছিলম া। নবীনদার আদেশে ড্রাইভার নাগপুরের রাস্তা ছাড়িয়া বন্য আতাবৃক্ষ শোভিত রামটেক পাহাড়ের ঘোরানো পথ ধরিল। মূলোর এ জিনিসটা মনঃপূত হইল না। সে দু-একবার মৃদু প্রতিবাদও করিল, বিশেষ কোনও ফল হইল না। আসল কথাটা আমরা জানিতাম। মিস সোরাবজি নামে একটি পার্শী তরুণীর সঙ্গে মূলো ভাব জমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে আজ মাস ছ-সাত ধরিয়া। মেয়েটির বাবা নাগপুরের ডাক্তার, তাহাদের বাড়ী সন্ধ্যাবেলাটা কাটানো মূলোর অনেক দিনের অভ্যাস, যদিও মেয়ের বাপ-মা তাহা যে খুব পছন্দ করেন তাহা নয়। মূলোর মুখে শুনিয়াই বুঝিয়াছি তাঁহারা মূলোকে এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এত ঘন ঘন সে যেন তাঁহাদের বাড়ী না আসে। কিন্তু মূলোর বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির স্থূল আবরণ তাঁহারা ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই।

পাহাড়ের নীচে গাড়ি রাখিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরিস্থিত রামসীতার মন্দিরে উঠিতেছিলাম।

মূলো বলিল—মিঃ রায়, একদিন মিস সোরাবজি বলেছিল রামটেকের মন্দির দেখবে, বড় ভাল হোত যদি আজ আনতাম।

নবীনদা আমার গা টিপিলেন। আমার হাসি পাইতেছিল, অতি

কষ্টে চাপিলাম !

পাথরে বাঁধানো অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির দু-ধারে অসংখ্য বন্য আতা, পড়াসি ও তিন্দুক গাছের নিবিড় বন। ডান দিকে অনাবৃত পর্বতগাত্র হেলিয়া থাকিয়া দৈত্যপুরীর মাইল-স্টোনের মত দেখাইতেছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ামাখা নিস্তব্ধতার মধ্যে পেশোয়াদের নির্মিত এই শৈলমন্দির দুর্গটি ভারতের অতীত গৌরবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছিল আমাদের কানে কানে। শুধু সে গাম্ভীর্যময় নিস্তব্ধতার তপোভঙ্গ হইতেছিল মূলোর অসম্ভব বকুনি দ্বারা। উপরে উঠিয়া আমরা বিগ্রহ দর্শন করিলাম। সামান্য কিছু প্রসাদ ও চরণামৃত পাইলাম। উঁচু পাহাড়ের উপর মন্দির, অনেক নীচে একদিকে রামটেকের বাজার।

মূলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইত, যদি সে এখানে আসিয়া মিস সোরাবজি সম্বন্ধে কিছু বলিত—আমরা ভাবিতাম লোকটার প্রাণে তবুও কবিত্ব আছে। কিন্তু মন্দির-দুর্গের চওড়া প্রাচীরের উপর বসিয়া আমরা যখন দূরের জ্যোৎস্নালোকিত খিন্‌সি হ্রদের দিকে চাহিয়া আছি, মন্দিরে প্রাচীন মারাঠী পুরোহিত রামসীতার আরতি করিতেছেন, পেশোয়াদের আমলের প্রথানুযায়ী আরতির সময় গম্ভীর নির্ঘোষে রণবাদ্য দামামা ও ডগর বাজিতেছে, ঐদিকে বহুদূরে কাম্‌টি ক্যাণ্টনমেণ্টের ক্ষীণ সারি, তখন যদি সে তাহার প্রণয়িনীর কথা তুলিত—আমরা ভাবিতাম এই রামগিরি আশ্রমে জনকতনয়ার স্নান হেতু পুণ্যোদকের স্পর্শে হর্স র‍্যাডিশ বুঝি কালিদাসের বিরহী যক্ষের দশা পাইয়া বসিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়, সে মহাড়ম্বরে গল্প জুড়িয়া দিল—দেশের এক মিউনিসিপ্যাল কমি-শনারকে সে কি করিয়া ভোট যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে নামিল তাহাদের দেশে কি করিয়া 'ফুটেরি' তৈরি করে। আমরা কহিলাম —ফুটেরি কি?

মূলো হাত দিয়া গোলাকার জিনিস দেখাইবার ইঙ্গিতে বলিল—এই

এত বড় বড়, আটার তৈরি, ভেতরে ছাতু, ঘুঁটের আগুনে সেঁকে ঘি দিয়ে খায়. আলুর চোখা আর বেগুনের ভর্তার সঙ্গে।

নবীনদা বলিলেন—মূলোর সঙ্গে নয়?

—নো, র‍্যাডিশ ইজ নট ইট্‌ন্—

—আশ্চর্য!

—হোয়াই আশ্চর্য? র‍্যাডিশ ইজ মাচ রেলিশ্‌ড্ ইন বেঙ্গল ইট সিম্‌স্—বাট নট সো ইন আওয়ার কান্ট্রি।

—বুঝলাম।

—আচ্ছা, এই দুর্গের পাঁচিলটা এত চওড়া কেন?

মূলোর স্থূল বুদ্ধিতে আর কতটুকু বোঝা সম্ভব? তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পেশোয়াদের সময়ে এই মন্দিরটি দুর্গের মত করিয়াই তৈরি হয় —আসিবার পথে অতগুলি ফটক দেখিয়া তাহা সে নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করিয়াছে। পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ এই মন্দির-দুর্গ নির্মাণ করিয়া এখানে একটি গুপ্ত ধনাগার স্থাপন করেন। আকস্মিক রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে নাগপুর হইতে বিশ-বাইশ ক্রোশ দূরবর্তী এই অরণ্যাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় রামসীতার মন্দিরে তাঁহার ধনভাণ্ডার অনেকটা নিরাপদ থাকিবার ভরসাতেই এটি নির্মিত হয়। বিশেষত তখনকার যুগে না ছিল রেল, না ছিল এখনকার দিনের মত চওড়া মোটর রোড! রাম-টেকের পাহাড় ছিল দুর্গম অরণ্যভূমির অন্তরালে—শত্রু সন্দেহ করিবে না যে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কোন্ পাহাড়ে রামসীতার মন্দির—সেখানে আবার ধনভাণ্ডার থাকিতে পারে। তবুও সাবধানের মার নাই ভাবিয়া বালাজি বিশ্বনাথ মন্দিরটিকে দুর্গের মত করিয়াই নির্মাণ করেন —মন্দিরকে মন্দির, দুর্গকে দুর্গ। আবশ্যক হইলে কিছুকাল ধরিয়া এখানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাও চলিতে পারিত। জলের অভাব দূর করিবার জন্য পাহাড়ের নীচে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়—আসিবার সময় যে পুকুরটা ডান দিকে পড়িয়াছিল। মূলো আমার মুখে রামটেকের

ইতিহাস শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আপনি এসব নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছেন দেখছি, বহুৎ পড়াশুনো করেছেন। এইজন্যেই তো বাঙালীদের আমি বড় ভালবাসি—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করলে আমার মন বড় খুশী হয়।

মন্দিরের আরতি থামিয়াছিল। আমি বলিলাম—এখানে একটা অস্ত্রাগার আছে বইয়ে পড়েছি—চলুন সেটা দেখে আসি সবাই, এখনও আছে বলে জানি।

মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রংড়ে ব্রাহ্মণ, পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথমে আপত্তি তুলিলেন, রাত্রে অস্ত্রাগার দেখানোর নিয়ম নাই —অবশেষে আমাদের নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া, বিগ্রহ যেখানে থাকেন তাহার পাশের একটা কুঠুরি খুলিয়া দিলেন। আমরা টর্চের আলোয় সেখানে মারাঠী যোদ্ধাদের প্রকাণ্ড চওড়া দুধার তলোয়ার, সাতহাত লম্বা বন্দুক, বিশাল ঢাল, লোহার জালের টুপি ও বর্ম, নানা রকমের তীর, আরও কত কি অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম। যোদ্ধৃজাতির যুদ্ধের উপকরণ পাঁচ রকম থাকিবে—ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। প্রশংসার ভাব মনে জাগিত হয়তো, যদি বর্গির হাঙ্গামার কথা মনে না উঠিত।

মূলো বলিল—এ আর কি, যোধপুর ওল্ড ফোর্টে একটা মিউজিয়াম আছে, সে এর চেয়ে অনেক বড়।

কোন কিছু দেখিয়া আশ্চর্য হইবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা—এ ক্ষমতা সকলের থাকে না, মূলোর মধ্যে তাহা থাকিবার আশা করি নাই; সুতরাং বিস্মিত হইলাম না।

নবীনদা বলিলেন—আপনাদের দেশে যোধপুরে একবার নিয়ে যাবেন আমাদের? অস্ত্রাগার দেখে আসব।

—নিশ্চয়ই। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের নিজ বাড়ীতেই একটি অস্ত্রাগার আছে, আমার পূর্বপুরুষের আমলের।

—বলেন কি মিঃ শুকরাম!

—হাঁ। আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন আওরঙজেবের আমলের লোক। তাঁর নাম—আচ্ছা নোটবুক দেখে বলব। আমরা হলাম ডোগরা রাজপুত—ওয়ারিয়ান ক্ল্যান ডোগরা রাজপুত জানেন তো? আমাদের সেই পূর্বপুরুষ, তিনি লড়েছিলেন জয়সিংহের সৈন্যদলে। এখনও অস্ত্রাগারের পূজো হয় আমাদের বাড়ী। ধূপধুনো জ্বালাতে হয়, সিঁদুর মাখাতে হয়—

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—সাবাস মূলো! ডোগরা রাজপুত হয়ে মরতে এসেছ কেন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে? ও কি তোমার হবে?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া, মূলোর দু-কূলই গিয়েছে। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা নেই, লেখাপড়ারও বুদ্ধি নেই—একে বলে হর্স র‍্যাডিশ।

মূলো বলিল—কি?

নবীনদা বলিলেন—কি রকম বড় বংশে জন্ম আপনার তাই বলছি—ডোগরা রাজপুত যোদ্ধা জাত কিনা!

মূলো বলিল—যাক, মিঃ বোস, একটু চা খাওয়ার জোগাড় হয় না? চা না খেলে আর তো চলে না।

মন্দির হইতে নামিয়া রামটেকের বাজারে চায়ের দোকানে চা পান করিয়া নাগপুরে ফিরিলাম। এত ভাল ভাল জিনিস যে সারাদিন ধরিয়া দেখিলাম মূলো সেসব সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। তাহার যতসব বাজে গল্প আর অনবরত বকুনির জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না।

পরদিন সকালবেলা মূলো আসিয়া হাসি মুখে বলিল—আপনাদের ওবেলা আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞেস করিলাম—কোথায়?

—লিস সোরাবজির বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আমরা কেন?

—আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন ওঁর বাবা।

আমরা বিকালে সাজগোজ করিয়া বসিয়া আছি, মূলো আর কিছুতেই আসে না। নবীনবাবু বলিলেন—ওহে, মূলোটার মতলব শুনে আমাদের হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখছি। ও এল না।

এমন সময় মূলো আসিয়া হাজির হইল—সে নিখুঁত সাজপোশাক করিয়া কোটের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া রুমালে এসেন্স ঢালিয়া আসিয়াছে এবং বোঝা গেল যে, সে কিছু পূর্বে নাপিতের দোকান হইতে চুলও কাটিয়া আসিয়াছে।

মিস সোরাবজির পিতা এখানকার ডাক্তার। পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল—বৃদ্ধ অতি অমায়িক লোক। দেখিলাম তিনি শুধু আমাদের তিনজনকে চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা নহে, শহরের আরও আট-দশটি ভদ্রলোককে বলিয়াছেন—তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উৎসব চা-পার্টির আসল কারণ।

মিস সোরাবজি আঠার-উনিশ বছরের একহারা মেয়ে, আমরা তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। খাঁড়ার মত উঁচু সূচাল নাকের জন্য কোনদিনই মিস সোরাবজিকে বিশেষ সুন্দরী বলিয়া আমার মনে হয় নাই—যদিও রং বেশ ফরসা ও গলার সুর কষ্টকৃত মেমসাহেবিয়ানার দোষমুক্ত না হইলেও মন্দ নয়। মেয়েটি নাকি লেখাপড়াতে ভাল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম আমরা দুজনেই। মিস সোরাবজি মূলোর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট—অন্তত হাবভাবে আমাদের তাহাই মনে হইল। বাহিরের বারান্দায় দুজনে নির্জনে মাঝে মাঝে যাইয়া দাঁড়াইতে

লাগিল। মূলোর এতটুকু ইচ্ছাও যেন মিস সোরাবজি তখনই পূর্ণ করিতে ব্যগ্র। অতিথির প্রতি যতটুকু কর্তব্য করা উচিত শেষ করিয়া মেয়েটি মূলোকে লইয়া সব সময় ব্যস্ত রহিল।

চা-পার্টি হইতে ফিরিবার পথে মূলো কি আমাদের ছাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আসিল!

কিন্তু তাহার যা স্বভাব—মিস সোরাবজি সম্বন্ধে একবারও একটি কথাও বলিল না। চা-পার্টির কথাই যেন তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে এটুকু সময়ের মধ্যে।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—বাঁদরের—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা! কলেজের বেশ ভাল মেয়ে বলে শুনেছি—র‍্যাডিশটার মধ্যে কি পেলে খুঁজে!

দু দিন মূলো কি জানি কেন আমাদের বাংলোতে আসিল না। তৃতীয় দিন সকালবেলা একখানা মোটরগাড়ী বাসার সামনে দাঁড়াইতেই আমি আগাইয়া গেলাম—নবীনদা তখন বাসায় নাই। মোটর হইতে নামিলেন ডাঃ সোরাবজি। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—শুকরামকি এখানে এসেছিল? একটা জরুরী কথা আছে। আপনারা ওকে কত-দিন জানেন?

—খুব বেশি দিন নয়। কেন বলুন তো?

—ও আমার কাছে কিছু বলে না। কিন্তু আমার মেয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। আমি ওকে বাড়ী ঢুকতে দেব না। ওকে আপনারা বারণ করে দেবেন।

মূলোর হইয়া ওকালতি করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ওকে কি উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেন না?

ডাক্তার সোরাবজি রাগের সঙ্গে বলিলেন, ও একটা লোফার—ওর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে কেন? ওরা হল ডোগরা—আমি

আর্মিতে ছিলাম, ওরা সেখানে সাধারণ সেপাই এর কাজ করে ; সুবাদার হতে কাউকে দেখি নি। কেন জানেন ?

বলিলাম—কি ?

—খুব সাহস আছে, যা বলবেন তাই করবে—কিন্তু—

বলিয়া ডাক্তার সোরাবজি আঙুল দিয়া নিজের মাথায় দু-তিন-বার টোকা দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

—তাহলে বলে দেবেন দয়া করে।

—আজ্ঞে ওটা বলা আমাদের পক্ষে একটু শক্ত, বুঝতেই পারেন।

—আমি বললে একটু রূঢ় হয়ে যাবে।

—কিন্তু একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন—মিস সোরাবজির মনোভাব কেমন মিঃ শুকরামের ওপর, সেটা একবার—

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর মত একটা বাজে অপদার্থ লোকের হাতে মেয়ে দেব ? ও কোনওকালে বি-এ পাশ করতে পারবে ? কোনদিন নয়। আমার মেয়ে অনার্স ক্লাসের ছাত্রী, সকলের চেয়ে ভাল ছাত্রী—ওর সঙ্গে তার বিয়ে ! হাসির কথা।

পরদিন সকালে মূলো আমার কাছে আসিয়া গোপনে বলিল, মিঃ রায়, সব ঠিক হয়ে গেল।

—কি ঠিক হয়ে গেল মিঃ শুকরাম ?

—জালুর সঙ্গে বিয়ের। অবিশ্যি ওর সঙ্গেই কথা হোল—ওর বাবা এখনও জানেন না।

—খুব খুশী হলাম শুনে। তবে ডাক্তার সোরাবজিকে একবার বলুন।

—সে হয়ে যাবে। তা—বললেও হয়।

নবীনদা শুনিয়া বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার—মূলোর সঙ্গে অমন একটি চমৎকার মেয়ের বিয়ে !

ইতিমধ্যে মূলোর পরীক্ষা পড়িল—সে বি-এ পরীক্ষা দিয়া কিছু-

দিনের জন্য দেশে গেল। আমাদের বার বার অনুরোধ করিয়া গেল, আমরা যেন তাহাকে না ভুলি—চিঠি দিলে যেন উত্তর দিই।

দুই মাস কাটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য করিয়া দিয়া ডাক্তার সোরাবজি তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। শুনিলাম পাত্র পুণার মেডিকেল অফিসার, আই এম এস পদবীর লোক। মোটা বেতন পান।

আমরা বন্ধুর প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়া বলিলাম,—ও, আমরা জানতাম মিঃ শুকরাম—

বৃদ্ধ ডাক্তার রাগত-ভাবে বলিলেন, সে একটা লোফার, আগেই বলেছি। গেজেটটা দেখেছেন? তার নাম খুঁজে দেখবেন কোথাও নেই। আর আমার মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে।

আমরা সত্যিই দুঃখিত হইলাম মূলোর জন্য।

এত কথার পর বিকেলে যখন মূলো আসিয়া জানাইল মিস সোরাবজি ও আমাদের লইয়া সে পরদিন পিকনিকে যাইবে, তখন আশ্চর্য হইয়া গেলাম। নবীনদা হাঙ্গামায় পড়ার ভয়ে প্রথমটা যাইতে চাহিলেন না —কিন্তু শেষে যখন মূলোর মুখে শুনিলাম, মিস সোরাবজির ভাইও এই সঙ্গে যোগ দিবে তখন আমাদের যাইতে কোন আপত্তি রহিল না।

গোরেওয়াড়া হ্রদের ধারে পিকনিক ঠিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে দল বাঁধিয়া দুখানা মোটরে হ্রদের ধারে পৌঁছিলাম। নাগপুরের পাহাড়ের মধ্যে যতগুলি হ্রদ আছে এটি সর্বাপেক্ষা বড়, দৃশ্যও চমৎকার। আমরা উত্তর পাড় ধরিয়া হ্রদের ওপারে অনুচ্চ পাহাড়ের তলায় বড় বড় তিন্দুক গাছের ছায়াতে আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দেশ করিলাম। মিস সোরাবজির ভাইটির বয়স চোদ্দ-পনেরর বেশি নয়,

বালক মাত্র—তাহার মনে দেখিলাম খুব ফুর্তি, হ্রদের জলে সাঁতার কাটিবার জন্য সে স্নানের পোশাক পর্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মিস সোরাবজি মেয়েটিকে ঠিক বোঝা কঠিন। এদিনও দেখিলাম মূলোর প্রতি তাহার যথেষ্ট আকর্ষণ, তাহার এতটুকু সুখ-সুবিধার জন্য মেয়েটির কি উদ্বেগ। অবশ্য আমাদের তুজনের সঙ্গেও সে ভাল ভাবেই মিশিল। এতটুকু অহংকার নাই, বাঙালী মেয়ের মতনই সরলতা, পরের সুখ-সুবিধা দেখার অভ্যাস, নিজের হাতে সেবা করিবার ঝোঁক। সে যে বি-এ ক্লাসের ভাল ছাত্রী তাহার কথাবার্তা হইতে এতটুকু তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আমাকে বলিল—মিঃ রায়, একটা বাংলা গান করুন না?

আমি গান গাহিতে ভালই পারিতাম। এখন চর্চার অভাবে গলায় সুর নাই—সে আপত্তি বলা বাহুল্য টিকিল না, পর পর তিনটি রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে হইল। বাঙালী সমাজ নয়, বিশেষত কলিকাতা হইতে বহুদূরে, কাজেই ভুল ধরিবার কেহ নাই—বেপরোয়া হইয়া গাহিলাম। প্রশংসাও অর্জন করিলাম মূলো ও মিস সোরাবজির কাছে।

মূলো বলিল—ওয়াণ্ডারফুল। এমন গান যে আপনি গাইতে পারেন, তা জানতাম না বাস্তবিক।

মিস সোরাবজি বলিল—টাগোরের কবিতা মুখস্থ আছে?

—তু-একটা—

—আবৃত্তি করুন না! আমাদের কলেজে মিঃ সেনের মেয়ে এক-বার করেছিল, বড় ভাল লেগেছিল আমার।

'জীবনদেবতা' কবিতাটি মুখস্থ ছিল ভাল, আমার মুখে শুনিয়া মিস সোরাবজি উচ্ছ্বসিত সুরে বলিল—ভারি সুন্দর!

তাহার পর সে তাহার শুভ্র গ্রীবাটি তুলাইয়া আবদারের সুরে বলিল—মিঃ রায়, আর একটা আবৃত্তি করবেন দয়া করে?

—আগে আপনি একটা ইংরেজি আবৃত্তি করুন।

—করবেন তাহলে ?

মিস সোরাবজির খড়্গের মত সূক্ষ্ম ও উগ্র নাসিকাকে ক্ষমা করিলাম, মেয়েটি অত্যন্ত চালবিহীন ও অমায়িক, তখনই সে ব্রাউনিঙের 'বৈয়াকরণের শবযাত্রা' নামে বিখ্যাত কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিল।

পুনরায় আমাকে একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল। এবার হাত-মুখ নাড়িয়া শিশির ভাদুড়ীর অনুকরণে 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করিয়া, ইংরেজিতে ভাবার্থ বুঝাইয়া দিলাম। পূর্বের কবিতাটি অপেক্ষা এইটিই মিস সোরাবজির বেশি ভাল লাগিয়াছে, তাহা তাহার কথার সুরে ও চোখ-মুখের ভাবে আমার বুঝিতে দেরি হইল না। আমায় বলিল—দেখুন মিঃ রায়, টাগোরের কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনি আর ঝংকারের মধ্য দিয়ে যে ওসব কাবতা এমন চমৎকার শোনায়, তা আমি আজ এই প্রথম জানলাম। এর আগে একবার বাংলা আবৃত্তি শুনেছিলাম কলেজে, সে তেমন কিছু নয়। আমার বাংলা শেখার বড় ইচ্ছে, কি করে শেখা যায় বলতে পারেন ?

মূলো দেখিলাম খুব খুশী হইয়াছে—কবিতা শুনিয়া নয়, কারণ সে সূক্ষ্ম রসবোধ তাহার ছিল না—বাংলা কবিতা ও প্রকারান্তরে বাঙালীর প্রশংসা করা হইতেছে এইজন্য। লোকটা অন্ধ বাঙালীভক্ত।

বলিল—জালু, তুমি মিঃ রায়ের কাছে কেন বাংলা শেখ না ? বেশ ভাল হবে—

মিস সোরাবজি পুনরায় আবদারের ভঙ্গিতে তাহার সুঠাম শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া বলিল—শেখাবেন আমাকে মিঃ রায় ? আমি রোজ আপনার বাসায় আসব এক ঘণ্টা করে ?

মূলো পরম উৎসাহের সুরে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ, বেশ !

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—ওর তাহলে বড় সুবিধে হয়, দুবেলা দেখা হয় কিনা। মূলোর কাণ্ড দেখ—সাধে কি বলে হর্স র‍্যাডিশ!

মূলো মিস সোরাবজির সঙ্গে কথা কহিতে অন্যমনস্ক ছিল, নবীনদার বাংলা কথা শুনিতে পাইল না—নতুবা বলিত, হোয়াট। কি বললে বাংলাতে?

আমি ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বলিলাম—শেখালে তো বেশ হোত—কিন্তু আমাদের সময় নেই কিনা। দুজনকে টো টো করে সারাদিন নিজের কাজে বেড়াতে হয়, নইলে এ তো বড় আনন্দের কথা।

আমরা গোরেওয়াড়ার জলে নামিয়া সবাই স্নান করিলাম, মিস সোরাবজি পর্যন্ত। দুপুর ঘুরিয়া গিয়া একদিকে ছায়া পড়িয়াছে—এখনও সেদিনকার সেই দিনটি চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে—একদিকে অনুচ্চ কালো পাথরের পাহাড়, অন্যদিকে শিউলি ও তিন্দুক গাছের সারি, দু-দশটা বড় বড় শালও আছে। আকাশে খর রৌদ্র, দুপুরের রোদে ঝক-ঝক করা চোখ-ঠিকরানো ছোট ছোট ঢেউ-এর সারি হ্রদের বুকে, অথচ এপার অনেকখানি ছায়াসিক্ত। আঁটসাট স্নানের পোশাকে শুভ্রদেহ কৃশাঙ্গী ভেনাসের মত পার্শী তরুণী জালু শৈল-বেষ্টিত হ্রদের নীল জল হইতে উঠিতেছে—দূরে ওপারে গোরেওয়াড়ার উঁচু পাড়ের উপর একটা বাংলো ধরনের বাড়ী, বোধ হয় এক ডাক-বাংলো।

আমরা রান্না করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, মিস সোরাবজির নিজের হাতে রান্না ভাত ও ডাল, কিছু মাংস, দু'একটা ভাজা। পার্শী ধরনের নুন দিয়া রান্না ভাত ও মশলাবিহীন সাদা রঙের মাংসের স্টু ও বেশনে টোমাটো ভাজা—সবগুলিই আমার মুখে সমান অখাদ্য। ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া নবীনদা কিছু আচার আনিয়াছিলেন—তাই দিয়া গ্রাস কয়েক ভাত খাওয়া গেল। মূলো পোষা কুকুরটির মত মিস সোরাবজির পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার রান্নার প্রশংসায়

পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার মত বটে—দেখিলাম তাহার বাঙালী-প্রীতি তাহার প্রণয়িনীর প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা কম নয়। বাঙালীর সব-কিছুর সে আজ ভক্ত, আমাদের কত কি ব্যাপারের প্রশংসা সে শতমুখে যদি বলিতে পারিত তাহার প্রণয়িনীর নিকট—তবে যেন তাহার তৃপ্তি হইত। বলিল, জান জালু, ওঁরা বাংলাতে মূলো কথার বড্ড ব্যবহার করেন, প্রায়ই ওঁরা বলেন র‍্যাডিশ—আমি শিখে নিয়েছি, একটা বাংলা ইডিয়ম, মানে 'খুব ভাল'।

নবীনদা অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, মরেছে হতভাগা!

মিস সোরাবজি আমাদের দিকে চাহিয়া কৌতূহলের সুরে বলিল—ও, হাউ ইণ্টারেস্টিং। সত্যি মিঃ রায়—আপনারা বুঝি—ইত্যাদি।

মেয়েটিকে যা তা বুঝাইয়া ও অন্য কথা পাড়িয়া চাপা দিলাম জিনিসটা।

বেলা তিনটার সময় আমাদের মোটর নাগপুর হইতে ফিরিয়া গোরেওয়াড়ার ওপারে আসিয়া ভেঁপু দিল। সকালে পৌছাইয়া দিয়া গাড়ী দুখানা চলিয়া গিয়াছিল। আমরা যাওয়ার উদ্যোগ করিতে মিস সোরাবজি বলিল—*সূর্যাস্তটা দেখে যাবেন না?*

—*ওদিকে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে—আপনার বাবা কি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না?*

—কিছু না মিঃ রায়, ভাববেন না। আমি বলে এসেছি—আমি ওই পাথরের ওপার থেকে দেখব সূর্যাস্তটা। তুমি এস না শুকরাম।

—যেমন ইচ্ছে আপনার। শীগগির আসবেন।

অদ্ভুত সূর্যাস্ত। এখানে আসিয়া অবধি হাইল্যাণ্ড ড্রাইভ হইতে সাতপুরা শৈলমালার দিকে প্রায়ই দেখিতেছি। সন্ধ্যার ছায়া নামে, আমি সামান্য শৈত্যের জন্য গরম আলোয়ান ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া দিই, হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে সাহেব মেমদের মোটরের ভিড় বাড়ে,

আম্বাসিরি লেকে পার্কে দলে দলে সুসজ্জিতা নরনারীরা বেড়াইতে আসিতে আরম্ভ করে, আমি বড় একটা শাল গাছের তলায় নির্জন প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া দেখি ধীরে ধীরে সাতপুরা শৈলশ্রেণীর আড়ালে লাল সূর্যটা নামিয়া পড়িতেছে। আজও দেখিলাম গোরেওয়াড়া হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি যেন আবীর-গোলা টকটকে লাল। যেমন সূর্য অস্ত গেল, অমনি চারিধারে ঘনছায়া নামিল, মোটর দুখানা অধীরভাবে ভেপু বাজাইতে লাগিল, বাদুড়ের দল পাহাড়ের দিকে ফিরিতে লাগিল, ক্রমে ছায়া ঘন হইয়া অন্ধকার নামিল।

নবীনদা বলিলেন—কই, মিস সোরাবজি কোথায় ?

—এই তো ছিল, সূর্যাস্ত ভাল দেখা যাবে বলে পাথরটার ওপারে গিয়েছে বোধ হয়।

এমন সময় মূলোর সঙ্গে মিস সোরাবজি পাথরের ওপাশের ঘাট থেকে উঠিয়া আসিল। উভয়েই স্নান করিয়া আসিল এই অবেলায়, দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

মূলো কৈফিয়তের সুরে বলিল—বড় গরম, তাই জালু বললে, বেশ স্নান করা গেল।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—তার পর তোমার জালুর নিউমোনিয়া হলে তার বাবা দেখে নেবে তোমাকে—মূলোগিরি খাটবে না তখন—

মূলো বলিল—কি ?

আমি উত্তর দিলাম, জালু নামটা বড় চমৎকার ! মিঃ বোসের মতে। অবশ্য আমারও সেই মত।

মিস সোরাবজি সলজ্জ হাসিয়া মেমসাহেবী সুরে বলল—ও ইউ হরিড ক্রিচারস্ !

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া চলিলাম।

সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের কিছু পূর্বে পাহাড়ী ঢালুতে অনেক বনশিউলি ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি বলিল—ও মিঃ রায় কি

চমৎকার ফুল ফুটেছে! শেফালি—না?

—মোটর থামাইয়া মূলো গোটাকয়েক ডাল ভাঙিয়া আনিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ লেশ মাটির বুকে। সাউথ টাই-গার গ্যাস রোডের এদিকটা নির্জন, এ সময় খুব বেশী লোকজন নাই। হঠাৎ মেয়েটি বলিল—চলুন, আম্বাসিরি লেক দেখে আসি। এ জ্যোৎস্নায় বেশ লাগবে

আমরা সকলেই হতবুদ্ধি। আম্বাসিরির দিকে যাইতে হইলে আবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বিপদে ফেলিল দেখিতেছি খেয়ালী পার্শী মেয়েটা। কি করা যায়, সুন্দরী তরুণীর আবদার উপেক্ষা করিবার সাধ্য নাই আমাদের—মোটর ঘুরাইয়া আবার সবাই পাহাড়ে উঠিয়া আম্বাসিরির দিকে ছুটিলাম। সেখানে লেকের ধারে পার্কে বিভিন্ন বেঞ্চিতে তখনও কেহ কেহ বসিয়া আছে। ক্রমে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া সেদিনকার খন্‌াস লেকের স্মৃতি মনের মধ্যে আনিয়া দিল। পাহাড়ের উপর হু হু ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরিল। জনবিরল হ্রদ-তীরের পার্কটিতে দূরে দূরে দু-একটি নরনারী বেড়াইতেছে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সবাই নামিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আরও চমৎকার লাগিতেছিল, নতুবা সাধারণত আম্বাসিরিতে বিকালের দিকে বড় ভিড় থাকে।

মিস সোরাবজিকে বলিলাম—কেমন লাগছে?

সে মেমসাহেবী সুরে সরু মিষ্টি গলায় টানিয়া বলিল—ও, ইট্‌জ ফা-ই-ন!

'ফা' হইতে 'ন' পর্যন্ত টানিয়া সুরের নামা-ওঠা করিয়া উচ্চারণ করিতে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড সময় লইয়া মধুর ধরনে গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বলিল। এই তো কলেজের ছাত্রী, কতই বা বয়স, কুড়ি-একুশের বেশি নয়—এ সব শিখিল কোথা হইতে কে জানে। নবীনদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাংলায় বলিল—মেয়েটার আবার

ভাবন দেখছ ?

আমিও বাংলায় বলিলাম—আমেরিকান ফিল্ম থেকে হলিউডের অ্যাক্‌ট্রেসদের সুর নকল করেছে কষ্ট করে। গলা মিষ্টি বলে মানিয়েছে।

মৃন্ময়ীর মনে কোনও কবিত্ব নাই। সে দেখিলাম মেয়েটির সহিত সূতা ও চরকা-কাটা সম্পর্কে কি কথা বলিতেছে। মিস সোরাবজি আমার কাছে আসিয়া বলিল—একটা কবিতা বলতে হবে—বলুন। এমন জায়গায় টাগোরের কবিতা একটি শুনব !

আবৃত্তি করিলাম—কি আর করি। মেয়েটির প্রাণে দেখিলাম সত্যই কবিত্ব আছে। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল প্রশংসায়। কিছু না বুঝিলেও ভাষার ধ্বনিতে ও ঝংকারে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় শেলির একটি কবিতা আবৃত্তি করিল।

বলিলাম—গান করুন না একটা।

মিস সোরাবজি হাসিয়া বলিল—ইংরিজি গান জানি, আপনাদের পছন্দ হবে না।

—ভারতীয় মেয়ে, দিশি গান শেখেননি কেন ?

—আমাদের কমিউনিটির সাহেবিয়ানা এজন্যে দায়ী মিঃ রায়। বাবা গভর্নেস রেখে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন, গান শিখিয়েছেন—তারা যে পথে নিয়ে গিয়েছে, সেই পথে যেতে হয়েছে আমায়। এখন জ্ঞান হয়ে সব বুঝতে পারি। এখন আমি গান্ধীবাদী, তা জানেন ? খদ্দর পরি অনেক সময়, মা পরতে দেন না—এই হোল কথা। ইচ্ছে হয় আমি শিখি ভারতীয় গান—খুব ভাল লাগে আমার।

নবীনদা হাসিয়া মনের আনন্দে একটা ভাটিয়ালি গান বেসুরে গাহিয়া ফেলিলেন। মিস সোরাবজিকে ইংরিজিতে তাহার অর্থও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। গানে, গল্পে, কবিতা-আবৃত্তিতে, হাসিখুশিতে সারাদিনটা কাটাইয়া রাত্রে যখন বাড়ী আসিয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন যেন মাথার মধ্যে উগ্র মদের নেশা। নবীনদারও তাই, কারণ—

তিনি আসিয়া পর্যন্ত গুন গুন করিয়া গান করিতেছিলেন।

মিস সোরাবজির বিবাহের অল্পদিন পরেই আমরা দুই বন্ধু নাগপুর হইতে চলিয়া গেলাম। বছরখানেক পরে আবার একবার বিশেষ কাজে নাগপুরে আসি।

সংবাদ লইয়া শুনিলাম বৃদ্ধ ডাক্তার সোরাবজি ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কেহই এখানে নাই—বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহারা বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে।

মূলোর খবর জানিবার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কাহাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার সোরাবজি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে সকলের নিকটই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মূলো জনৈক বিদেশী তরুণ ছাত্র—অমন ছাত্র নাগপুরে বহু আছে—কে কাহার খবর রাখে! আমরা ছাড়া আর সে কাহার সঙ্গে মিশিত জানি না, সুতরাং মূলোর খোঁজ লইবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপায় হইল না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রদে বেড়াইতে গিয়া মূলোর দেখা পাইলাম। নবীনদা তাহাকে প্রথম দেখেন। একখানা পাথরে ঠেস দিয়া কে একজন নির্জনে বসিয়া আছে দেখিয়া নবীনদাই বলিলেন—ওখানে কে দেখ তো হে!

গোরেওয়াড়া শহর হইতে বহুদূরে, এত দূরে কেহ বেড়াইতে আসে না সাধারণত—স্থানটাও নির্জন পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে। আমি একটু কাছে গিয়া দেখি—মূলো! নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা সেই রকমই, তবে দাড়ি কামায় নাই, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—মূলো একখানা খাতাতে কি লিখিতেছে। এত নিবিষ্টমনে লিখিতেছে যে, আমার পদশব্দ সে শুনিতে পাইল না। কবি হইয়া গেল নাকি ছোকরা?

তাহার পর আমাদের সঙ্গে সে নাগপুরে ফিরিল। শুনিলাম সে এবারও পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পাইয়া মূলো ছেলেমানুষের মত খুশী। চাপেবার দুগ্ধমন্দিরে লইয়া গিয়া আমাদের মিষ্টান্ন শরবত খাওয়াইয়া দিল। শুনিলাম দেশে তাহার মা মারা গিয়াছেন এই বৎসরেই।

বলিল—বড্ড একলা বোধ করি এখানে। মিশব কার সঙ্গে? এখানে মেশবার লোক নেই। বাঙালীদের সঙ্গে মিশে আরাম। গোরে-ওয়াড়া লেকে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে থাকি। বেশ লাগে। একদিন ওখানে বেশ কেটেছিল। মনে আছে সেই আমাদের পিকনিক? ওরা কোথায় যে তা তো জানি নে।

দেখিলাম মূলোর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটা ছবি—কয়েক শত বৎসর পূর্বের রাজপুতানায় বিশাল মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে চড়িয়া ইহার সেই বীর পূর্বপুরুষ চলিয়াছে জয়সিংহের সৈন্যদলের সহিত দেওধার যুদ্ধে, সেলিমগড়ের যুদ্ধে—চওড়া গালপাট্টাওয়ালা রুক্ষ-দর্শন মুখাবয়ব, দীর্ঘ দেহ, পাশে খোলা দীর্ঘ দুধার তলোয়ার, হাতে সাত হাত লম্বা বন্দুক—মৃত্যু নাই, ভয় নাই—কবাটের মত বিশাল বক্ষে জ্বলন্ত দুঃসাহস—কাহার সাধ্য ছিল তাহার মনোনীত কন্যাকে স্পর্শ করে! সে ছিনাইয়া আনিত তাহার প্রণয়িনীকে যে কোন লোকের হাত হইতে। লড়িত, খুন করিত।

আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় জয়সিংহের সৈন্যদলের সেই বীর নায়কের বংশধর এই সাহেবী পোশাক-পরা, নিখুঁত টাই বাঁধা, ঘাড়-চাঁচা, ক্লিন শেভ্‌ড, হাতে রিষ্টওয়াচ বাঁধা ছোকরা নিতান্ত নিরুপায়। কবিতা লেখা বা চোখের জল ফেলা ছাড়া সে হারানো প্রণয়িনীর জন্য কি করিতে পারে? বিশেষত যখন দুইবার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী না পাইয়া সে আরও দমিয়া গিয়াছে।

ছোকরার জন্য এই সর্বপ্রথম দুঃখ হইল।
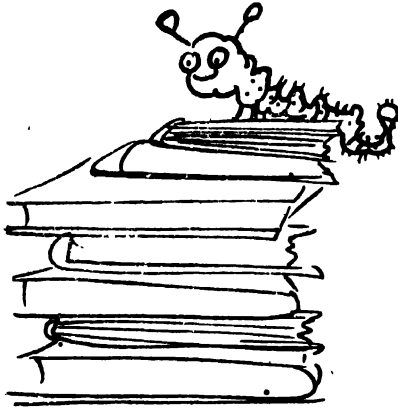
আচার্য কৃপালনী কলোনী

আমার স্ত্রী আমাকে কেবলই খোঁচাইতেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে বাড়ী। এই সময় জমি না কিনিলে পশ্চিমবঙ্গে ইহার পরে আর জমি পাওয়া যাইবে কি? কলিকাতায় জমি ও বাড়ী করিবার পয়সা আমাদের হাতে নাই, কিন্তু পনেরোই আগস্টের পরে কলিকাতার কাছেই বা কোথায় জমি মিলিবে? যা করিবার এইবেলা করিতে হয়।

সুতরাং চারিদিকে জমি দেখিয়া বেড়াই। দমদমা, ইছাপুর, কাশীপুর, খড়দহ, ঢাকুরিয়া ইত্যাদি স্থানে। রোজ কাগজে দেখিতেছিলাম জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। পূর্ববঙ্গ হইতে যে সব হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসহায় ও উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে বাড়ী ও জমির মালিকেরা একটুও বিলম্ব করেন নাই। এক বৎসর আগে যে জমি পঞ্চাশ টাকা বিঘা দরও হইত না, সেই সব পাড়াগাঁয়ের জমির বর্তমান মূল্য সাত-আটশো টাকা কাঠা।

বহুস্থানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইলাম।

কলিকাতার খুব কাছাকাছি জমির দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে, আমাদের সাধ্য নাই ওসব স্থলে জমি কিনিবার। তাছাড়া জমি পছন্দই বা হয় কই?

এমন সময়ে আমার স্ত্রী একখানা কাগজ আনিয়া হাতে দিলেন; বলিলেন—তোমার তো জমি পছন্দই হয় না। ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় করে ফেললে। সিনারি নেই তো কি হয়েছে? এটা পছন্দ হয় না, ওটা পছন্দ হয় না। এবার কি আর কিনতে পারবে কোথাও? যাও এটা দেখে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে। তোমার মনের মত। পড়ে দ্যাখো—

আমাকে আমার স্ত্রী যাহাই ভাবুন, হিম হইয়া বসিয়া আমি নাই। সত্যিই খুঁজিতেছি, মন-প্রাণ দিয়েই খুঁজিতেছি। ভালো জিনিস পাইলে আমার মত খুশী কেহই হইবে না।

বলিলাম—এ কাগজ কোথায় পেলে?

—বীণাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ওরাও জমি খুঁজচে, ওদের দেশ থেকে সব উঠে আসচে ইদিকে, কলকাতার আশেপাশে। ওরা এটা কোথা থেকে আনিয়েচে।

পড়িয়া দেখিলাম। লেখা আছে—

'আচার্য কৃপালনী কলোনী।'

আজই আসুন। দেখুন!! নাম রেজেস্ট্রি করুন!!!

কলিকাতার মাত্র কয়েক মাইল দূরে অমুক স্টেশনের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিরাট নগরটি গড়িয়া উঠিতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলোনির পাদদেশ ধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, স্কুল, মেয়েদের স্কুল, গ্রন্থাগার, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখ-সুবিধাই এখানে পাওয়া যাইবে। আপাতত পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলে নাম রেজেস্ট্রি করিয়া রাখা হইবে।'

স্টেশনের নাম পড়িয়া মনে হইল, কলিকাতার কাছেই বটে।

আমার স্ত্রী বলিলেন—দেখলে? ভালো না?

—খুব ভালো। বীণার কাকা জমি নিয়েচেন এখানে?

—না, নেবেন। নাম রেজেস্ট্রি করেচেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দাও। কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, জমি পরে দেখো। উনিও ত দেখেনান এখনো।

—জমি দেখবো না? আচ্ছা, বীণার কাকাকে জিগ্যেস করি।

বীণার কাকার নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। চিরকাল বিদেশে চাকুরী করিয়াছেন, কোথাও বাড়ীঘর করেন নাই, জমি বাড়ী সম্বন্ধে খুব উৎসাহ। আগে-আগে ভাবিয়া আসিয়াছেন কলিকাতায় বাড়ী করিবেন, সম্প্রতি সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তাহরণবাবু বলিলেন—আসুন। ও কাগজটা আপনি দেখেচেন? ভালো জায়গাই বলে মনে হ'চ্ছে।

—একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে না কি?

—ওর চেয়ে কাছে আর কোথায় পাবেন মশাই?

—তা বটে! স্টেশনের কাছেই, গঙ্গার পারে।

—এখনো সস্তা আছে। এর পরে আর থাকবে না। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা—

—আপনি টাকা পাঠিয়েচেন?

—নিশ্চয়। রসিদ এসে গিয়েচে। আপনি যদি নেবার মত করেন--তবে টাকা পাঠিয়ে দিন।

—জমি না দেখেই?

—ও মশাই, এইবেলা নাম রেজেস্ট্রি করে রাখুন। এর পরে আর পাবেন না। ঠিকানাটা হচ্ছে—দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্ট,। রাজীব-নগর।

আমার স্ত্রী আমার নামের রসিদ দেখিয়া খুশী হইলেন। বলিলেন—কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা। ক' কাঠার জন্যে টাকা পাঠালে, মোটে দু'কাঠা?

—এখন এই থাক্। পনেরোই আগস্ট কেটে যাক। সীমানা-কমিশনের রায় বের হোক। পরে—

পনেরোই আগস্ট পার হইয়া গেল। সীমানা-কমিশনের রায় আর বাহির হয় না। আমার স্ত্রী বলিলেন—একবার জমিটা দেখে এসো না? বীণার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও—অনেক লোক আসচে ময়মনসিং, পাবনা, নোয়াখালি থেকে পালিয়ে। আমাদের পাশের বাড়ীর ফ্ল্যাট্‌গুলো সব বোঝাই। এক-এক গেরস্ত বাড়ীতে তিন-চার ঘর লোক আশ্রয় নিচ্চে।

—কেন নিচ্চে? কোথাও তো কোনো গোলমাল নেই।

—তা কি জানি বাপু, অত-শত জিগ্যেস্ করেচে কে? বীণাদের বাড়ীই ওর পিসতুতো ভাই আর বীণার দাদামশায়ের ছোট ভাই এসেচেন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কথাটা মন্দ নয়। নাম রেজেস্ট্রি করিয়াছি, জমি কোথাও যাইবে না। তবে আর এক-আধ কাঠা বেশী রাখিব কি না, ইহাই ধার্য করিবার পূর্বে কলোনিটা একবার চোখে দেখা উচিত নয় কি?

সন্ধ্যার সময় ঝড়ের বেগে বীণার কাকা আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলাম—ব্যাপার কি? এত ব্যস্ত কেন?

—নিয়ে নিন, নিয়ে নিন। জমি কোথাও এতটুকু পাওয়া যাবে না এর পরে। হাজার হাজার লোক আসচে 'ইস্টবেঙ্গল' থেকে। আমার বাড়ী তো ভর্তি হয়ে গেল। জমি এইবেলা যা যেখানে নেবার নিয়ে নিন।

—বলেন কি?

—সত্যি বলচি। কলোনির জমিটা চলুন কাল দেখে আসি। দেখে এসে কিছু বেশী করে জমি ওইখানেই কিনে রাখুন। কত করে দাম নেবে তা কিন্তু এখনো বলে নি। কাল সেটাও ওদের আপিস থেকে জেনে আসি চলুন—

—কোথায় যেন ওদের আপিস ?

—রাজীবনগর। কোন্নগরের কাছে।

পরদিন কিন্তু আমাকে একাই যাইতে হইল।

বীণার কাকা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার বাড়ীতে আবার তুটি গৃহস্থ আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কোন্নগর স্টেশনে নামিয়া রাজীবনগর যাইতে মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। স্টেশনের সংলগ্ন তো নয়ই। পাকা আড়াই মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা কাদায় ভর্তি। যেমন জঙ্গল, তেমনি মশা।

খোঁজ করিয়া এক গ্রাম্য ডাক্তারবাবুকে জমির মালিক হিসাবে পাওয়া গেল! তিনি একখানা টিনের ঘরে রোগীপত্র দেখিতেছিলেন, যাহাদের সংখ্যা আর যাহাই হউক ডাক্তারের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু নহে। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চাচ্চেন ?

বিনীতভাবে বলিলাম—আপনারই নাম মণীন্দ্র ঘটক? আমি যশোর থেকে আসচি। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলিলেন—ও—

এবং পরক্ষণেই রোগীদের দিকে মনোযোগ দিলেন পুনরায়।

আমি বড় আশা করিয়াই গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে স্টেশনের গায়ে জমি, এ জমিটা লইতে পারিলে নানা-দিক দিয়াই সুবিধা। কিন্তু জমির মালিক অত নিস্পৃহ কেন। তবে কি বিক্রয় করিবেন না মনস্থ করিলেন ?

প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া গেল।

দাঁড়াইয়াই আছি। কেউ বসিতেও বলে না।

আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—আমি—মানে, এই ট্রেনেই আবার—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি বলচেন ?

—জমিটা—

—কোন্ জমি ?

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—স্টেশনের সংলগ্ন—কৃপালনী কলোনি—

—ও।

আবার রোগীদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আমিও অতটা সুবিধাসম্পন্ন যে জমিটুকু তাহার খোদ মালিককে বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

দশ মিনিট কাটিল।

এবার ডাক্তারবাবুই আমাকে বলিলেন—তা, বসুন।

বসিবার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকক্ষণ হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। বসিবার মিনিট দুই পরে আমি বলিলাম—ইয়ে—জমিটার কথা—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কী বলচেন ?

—জমিটার কথা বলছিলাম। মানে—একবার দেখলে ভালো হয়। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে—

—জমিটা দেখবেন ? ও কার্তিক, কার্তিক! যাও, এই বাবুকে জমিটা দেখিয়ে আনো।

ভাবিলাম, তাই তো ইহা আবার কি। ডাক্তারখানার পাশের ঘরে বড়-বড় হরফে ইংরাজীতে লেখা আছে বটে, 'দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্ট'।

গঙ্গার ধারে বিরাট ভূখণ্ড লইয়া এই উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে—কিন্তু গঙ্গা হইতে রাজীবনগরই তো দেখিতেছি আড়াই মাইল দূরে। তবে ইহাও হইতে পারে দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাস্টের আপিস এখানে, জমি গঙ্গার ধারে।

কার্তিক নামধেয় লোকটি ডাক্তারবাবুর আহ্বানে এইমাত্র আসিয়া-

ছিল। বলিল—কোন্ জমি বাবু?

—আরে, ওই যে বরোজের পশ্চিম গায়ে—

—জমি?

—আ মলো যা। হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হ্যাঁ, জমি। কোথাকার ভূত?

বাড়ীর চাকরটা বোধ হয় বোকা, প্রভুর এমন মূল্যবান ভালো বহুবিজ্ঞাপিত ভূমিখণ্ডের সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না কেন?

আমি পথে বাহির হইয়া বলিলাম—চলো—

লোকটা পশ্চিমদিকে যাইতেছে দেখিয়া বলিলাম—ওদিকে কোথায় যাচ্চো? ইস্টিশানের কাছে যে জমি—কৃপালনী কলোনি—

—ইস্টিশানের কাছে কোনো জমি নেই বাবু।

—আলবৎ আছে? তুমি কোনো খবর রাখো না।

—না বাবু, কোনো জমি নেই ওদিকে।

—শোনো। ইস্টিশানের গায়ে। কাগজে যে জমির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে নাম রেজেস্ট্রি করতে বলা হয়েছিল যে জমির জন্যে। আমি নাম রেজেস্ট্রি করে রেখেছি—রসিদ আছে পকেটে—

—এ-কথাটা আপনি ওখানে বললেন না কেন বাবু। আমি তো আর কোনো জমির সন্ধান জানি না। কালও তো এক বাবু এসে-ছিলেন, তিনিও নাম রিজিস্টারি করে নিয়ে গেলেন।

—জমি দেখেন নি?

—না। ডাক্তারবাবু বললেন, জমি দেখে যাবেন সামনের রবিবারে।

—বেশ, আমায় নিয়ে চলো—

—বাবু—

—কি বলে আবার?

—আপনি জমি দেখতে চান?

—কি বলে আবোল-তাবোল ? জমি দেখবো না তো কি ?

—আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস্ করে আসি।

আমি বিরক্ত হইয়া নিজেই আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। বলিলাম—আপনার চাকর জানে না আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

এবার ডাক্তারবাবু দেখিলাম, আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনিও জমির জন্যই আসিয়াছেন মনে হইল। কারণ তিনি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নাম রেজেস্ট্রি করিলেন। ডাক্তারবাবু রসিদ কাটিয়া দিলেন দেখিলাম। লোকটির সঙ্গে আরো কি কথা হইয়াছে জানি না, দু'টাকা দিয়া রসিদ লইয়া লোকটা চলিয়া গেল।

আমাকে ডাক্তারবাবু বলিলেন—জমি দেখবেন ? আচ্ছা, চলুন, আমিই যাচ্ছি।

পরে আমাকে দুর্গন্ধময় জল-ভর্তি নালা, কচুবন, ভাঙা চালাঘর প্রভৃতির পাশ দিয়া কোথায় কোন্ অনির্দেশ্য রহস্যের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন, তিনিই জানেন।

আমি একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বোধ হয় ভুলিয়া যাইতেছেন, এ জায়গাটি স্টেশনের খুব কাছে। স্টেশনের সংলগ্ন বলিয়া বিজ্ঞাপনে আছে—

ডাক্তারবাবু আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—আপনার তো আইডিয়া দেখছি বেশ। স্টেশন-সংলগ্ন মানে কি একেবারে কোন্নগর ইস্টিশনের টিকিটঘরের পাশে হবে মশাই ?

বলিতে পারিতাম, 'সংলগ্ন' বলিতে দুই মাইল দূরবর্তীই কি বোঝায় ? কিন্তু না, দরকার নাই! পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দু আমি, এখানকার জমির মালিকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করিব না। স্থান পাওয়া লইয়া কথা। চটিয়া গেলে জমি না দিতেও তো পারে।

বিনীতভাবে বলিলাম—কলোনি কতদূর ?

—মাইলখানেক দূরে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বলেন কি ? তবে সাড়ে-তিন মাইল দূর পড়লো স্টেশন থেকে। এর নাম 'সংলগ্ন' ? এ তো কখনো শুনিনি—

ডাক্তারবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—না শুনেচেন কি করবো ? কিন্তু আপনাকে বলচি, কলোনির এক ইঞ্চি জমি পড়ে থাকবে না। সব নামে-নামে রেজেস্ট্রি হয়ে যাচ্চে। আপনার ইচ্ছে না হয়, না নেবেন। তবে কি দেখতে যাবেন, না, দেখবেন না ?

—চলুন যাই।

পকেট হইতে একগোছা চিঠি বাহির করিয়া ডাক্তারবাবু আমার নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন এই দেখুন। মনিঅর্ডারে টাকা আসচে অফিসে, রোজ একগোছা চিঠি আসচে, আপনি দেখুন না মশাই। না দেখলে ঠকবেন এর পরে। তবে আপনি না নিলে জোর করে তো আপনাকে দেওয়া হবে না—

রাস্তায় ভীষণ কাদা। একটা গোয়াল-পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, মহিষ ও গরুর বাথান চারিদিকে। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাতাসে। ইহাতে মশা বিন্-বিন্ করিতেছে। খানিকদূর গিয়া একটা অবাঙালী কুলি বস্তি, যেমন নোংরা, তেমনি ঘিঞ্জি। তারপরে আবার জঙ্গল বাঁশবন আর ডোবা।

মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের একপাশে রাস্তার ধারে একটা টিনের সাইনবোর্ডে বড়-বড় করিয়া লেখা আছে—'আচার্য কৃপালনী কলোনি'।

এখানে আসিয়া ডাক্তারবাবু দাঁড়াইলেন। সামনের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—এই—

চারিদিক চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়বোধের শক্তিও যেন হারাইয়াছি। ইহার নাম আচার্য কৃপালনী কলোনি। এই সেই বহু-বিজ্ঞাপিত ভূখণ্ড ? কোথায় ইহার পাদদেশ

ধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে? কোথায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য? পঞ্চাশফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল প্রভৃতি ছবির সঙ্গে এই অন্ধকার বাঁশবন, কচুবন, ওলবন আর মশাভরা ডোবার সহিত খাপ খাওয়াইতে অনেক চেষ্টা করিলাম; মনকে অনেক বুঝাইলাম, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কি ছিল? অমুক কি ছিল? কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। তাহা ছাড়া এখানে ডাঙ্গা-জমিই বা কোথায়? সব তো জলেডোবা আর জলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে বনকচুর ঝাড়।

সে কথা বলিয়া লাভ নাই।

ডাক্তারবাবু গর্বের সহিত বলিলেন—সাড়ে ছ'শো করে কাঠা, তাই পড়্তে পাচ্ছে না। সব প্লটের নাম রেজেস্ট্রি হয়ে গিয়েচে মশাই।

কিন্তু 'প্লট' বলিতে জমির টুকরো বোঝায়, এখানে জমিই যে নাই, এ তো সবই জলাভূমি। পুণ্যতোয়া স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী ইহার ত্রি-সীমানায় আছেন বলিয়া মনে হইল না।

বলিলাম—গঙ্গা এখান থেকে কতদূর?

—বেশী নয়। মাইল খানেক হবে কিংবা কিছু বেশী হবে—

তাই বা কি করিয়া হয়? গঙ্গা এখান হইতে চারি মাইলের কম কি করিয়া হয়, বুঝিলাম না।

সে যাহা হউক, তর্ক করিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। এই জলাভূমি আর কচুবনই হয়তো ইহার পর পাইব কি না কে জানে। মন ভীষণ খারাপ হইয়া গেল।

বাড়ী আসিতেই স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ গা, কি রকম দেখলে? ভালো?

বলিলাম—চমৎকার!

—বলো না, কি রকম জায়গা? গঙ্গার ওপর?

—সংলগ্ন বলা যেতে পারে।

—বেশ বড় রাস্তা করেচে ?

—মন্দ নয়। বড়ই।

বীণার কাকাকে সেদিন কিছু বলিলাম না। পঞ্চাশ টাকা জলে ফেলিলাম বটে, কিন্তু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ! পূর্ববঙ্গই ভালো ! আর জমি খুঁজিব না ঠিক করিয়া ফেলিলাম !

পরদিন র‍্যাডক্লিফের রায় বাহির হইল।

আমাদের দেশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে।

কমপিটিশন

শিবশঙ্কর সকালে উঠেই দু দফা ফোন করলেন। একবার য়্যাটর্নি রায় ও মিত্রের জীবনধন রায়কে ও আর একবার প্রসন্নদাস বড়ালের অংশীদার ও কর্তা হরিদাস বড়ালকে; কারণ ওঁদের আপিস এখনো খোলে নি।

—নমস্কার, কি খবর?

—আসুন একবার। কতদূর করলেন?

—আসবো এখন?

—এখানেই চা খাবেন।

একটু পরে বাড়ীর বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং জীবনধন রায় ঘরে ঢুকলেন। জীবনধন রায়ের পরনে সাহেবি পোশাক, চোখে স্টীলের ফ্রেমের চশমা, পায়ে পেটেণ্ট চামড়ার চকচকে বুট, বগলে ফোলিও ব্যাগ।

—আসুন, মিঃ রায়, বসুন। নমস্কার।

—নমস্কার।

—ওরে, চা নিয়ে আয়। তারপর?

—তৈরি। সরেজমিন তদারক করবেন না?

—রেজেষ্ট্রী আপিস সার্চের রেজাল্ট কি ?

—ভালো। দাগী মাল নয়, তবে দেড়—দেড়ের কমে হবে না। আমাদের তিন পার্সেণ্ট।

শিবশঙ্কর বাবু হরিশ মুখুয্যের স্ট্রীটে তিনতলা বড় বাড়ী কিনচেন এঁদের দালালিতে। দেড় লক্ষ টাকা দাম, য়্যাটর্নিরা তিন পার্সেণ্ট কমিশন নেবেন—আসল কথা হচ্চে এই।……রূপোর ট্রে ভরে টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ ও লেটুস সেদ্ধ এল, তার সঙ্গে চায়ের লিকার, দুধ চিনি আলাদা।

শিবশঙ্কর বাবু বললেন—মিষ্টি দিই নি—কারণ আমাদের এ বয়সে—

—না না। থাক। তারপর আমার গাড়ী রেডি, চলুন একবার সরেজমিনে। জিনিসটা দেখুন।

—বেড রুম কতগুলো ?

—উনিশটা রুম সবসুদ্ধ ওপরে নিচে। ছটা বাথরুম, এ বাদে বাইরে তিনটে আলাদা পাইখানা। খুব ভালো বাড়ী। কুণ্ডু কোম্পানীকে রাজী করতে বেগ পেতে হয়েচে খুব। বুড়ো একেবারে বেঁকে বসেছিল শেষকালে।

—এখন যেতে পারবো না—মাপ করুন। এখন বেলা দশটা পর্যন্ত মরবার ফুরসত নেই—এখুনি আবার লোক আসবে—

—আচ্ছা উঠি তাহলে। ওবেলা আপিসে ফোন করবেন এখন—ওখান থেকে যাওয়া যাবে।

একটু পরে হরিদাস বড়ালকে আবার ফোন করা হোল।

—নমস্কার কি খবর ? হ্যাঁ, একবার, করেছিলাম—হ্যাঁ—এই আধ ঘণ্টা আগে। হ্যাঁ। সোনাটার কি হোল ? বারের দাম কত বললেন ? তিন আনা ? আমার চাই কিছু—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—আচ্ছা। আজ ?—হ্যাঁ—আচ্ছা। আপিসে ? আচ্ছা।

সাধারণ লোকে এ কথাবর্তা থেকে বিশেষ কিছু বুঝবে না, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর 'বড়াল বার' নামক বিখ্যাত স্বর্ণের বাট কিনবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ক্রয়-বিক্রয়ের পালা শেষ হোতেই শিবশঙ্করের আপিস ম্যানেজার ও তদারককার মিঃ ঘোষাল ঢুকে শিবশঙ্করকে খানিকটা নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা শুরু হোলো তা স্কোয়ার ফুট রেট, পার্সেণ্ট, ইস্পাতের জালতি, সিমেণ্ট, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম, গ্যারিসন্ এনজিনিয়ার প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ ও কণ্টকিত। আজই মিঃ ঘোষালকে আপিসের কাজে তেজপুরে যেতে হচ্ছে, ফোনে এখুনি আসাম মেলে বার্থ রিজার্ভ সম্বন্ধে শেয়ালদা স্টেশনের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হোলো। অন্য অন্য কথার পরে বেলা ন'টার সময়ে মিঃ ঘোষাল বললেন—তা হোলে আমি উঠি—

—কত টাকার দরকার?

—সতেরো হাজার তো ওদের পেমেণ্ট করতে হবে, আর পূজোর ব্যবস্থা—তাও তিন হাজার নেবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাজার খানেক দিতে হবে উপদেবতাদের। মিসেস বর্মণকে একটা প্রেজেণ্ট দিতে হবে ভাল দেখে। কি দেওয়া যায়, স্যার, আপনিই বলুন।

—একটা জড়োয়ার কিছু দাও গিয়ে—হাজার খানেকের মধ্যে। বিশ হাজারের একটা চেক নিয়ে যাও—

—আজ্ঞে স্যার, ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানোর আমার সুবিধে হবে না। একটায় আসাম মেল। তার আগে আমার অনেক কাজ। একবার আপিসে যেতে হবে। ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্র রয়েচে, নিয়ে যেতে হবে। গহনাই বা কিনবো কখন?

—আচ্ছা গহনার জন্যে আমি সুরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বদ্রিদাসের বাড়ী। যদি কিছু ভালো থাকে দেখে আসুক। সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখান থেকে বাড়ি যাও—নেয়ে খেয়ে গাড়ী নিয়ে

ব্যাঙ্কে গিয়ে আগে চেক ভাঙাও। ওখান থেকে ইস্টিশানে চলে যাও—গয়না যদি পাই সুরেশকে দিয়ে ট্রেনে পাঠাবো। মিসেস বর্মণকে খুশী রাখা চাই মোটের ওপর। দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হোলে দেবীর পুজো না দিলে হয় না। কমপিটিশনের বাজার, বুঝে কাজ করবে।

ডাক এল। এক গাদা চিঠি। হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার দেখে নিতে নিতে শিবশঙ্কর ডেকে বললেন—ও রিতুয়া, নিয়ে যা—বড় বৌমার চিঠি, নিয়ে যা—সুলেখার—ছোট বৌমার—ওপরে দিগে যা! আর শোন—বলে আয় আমি চান করবো এখুনি।

খাবার ঘরে পুত্রবধূ নন্দা ভাত নিয়ে এলো টেবিলে। ছোট বাটিতে কাঁচামুগের ডাল, বে-মশলার মৌরলা মাছের ঝোল আর কাগজি লেবু কাটা পৃথক ডিশে। সামান্য একটু ঘরে-পাতা দই শ্বেতপাথরের বাটিতে। শিবশঙ্কর খেয়ে হজম করতে পারেন না, লিভারের রুগী। পুত্রবধূ বললে—ও বেলা কখন ফিরবেন বাবা?

—তা কি বলতে পারি কখন ফিরবো? নানা কাজ। তারপর আজ য়্যাটর্নির সঙ্গে গুরুতর কাজ রয়েচে। কেন?

পুত্রবধূ হেসে বললে—আমরা ভাবচি বেহালা যাবো পিকনিক করতে। গাড়ীখানার দরকার ছিল—

ও—। তা—কটার সময় যাবে। গাড়ী না হয় শোভা সিং আপিস থেকে নিয়ে আসবে এখন। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আসবার সময় তোমরা ট্যাক্সিতে এসো। পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে দিও—বিমান কোথায়? ওপরে আছে?

পুত্রবধূ মুখ নত করে বললে—তা তো জানি নে বাবা।

—তার মানে? বেরিয়েছে?

পুত্রবধূ পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সেদিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিলে—উনি কাল রাত্তিরে তো বাড়ী আসেন নি।

—সে কি কথা! কালও আবার আসে নি—হুঁ—

শিবশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, আর কিছু বললেন না।

বেলা একটা। শিবশঙ্করের আপিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বেশি বড় আপিস নয়। জন আট নয় কেরানী বিবিধ খাতা নিয়ে ব্যস্ত। একজন ছোকরা টাইপরাইটারে ঠকঠক টাইপ করচে। শিবশঙ্করকে আপিসে ঢুকতে দেখে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

দেখতে আপিস ছোট হোক, কিছু দিন আগে এই আপিসে বসেই শিবশঙ্কর সরকার চালের কারবারে কম করেও সাত লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়েচেন। তেরশ' পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষের বছর। তেরো সিকে দরে ধানের মণ কিনে সাথে ষোল টাকা মণ দরে ধান বিক্রি করেন। চালের কনট্রাক্ট নিয়ে এক হাজার টন চাল খরিদ করেন ত্রিপুরা জেলা থেকে। তারপর সে দেশে চালের দর উঠে গেল চল্লিশ টাকা মণ।

ভালো করেন নি তা নয়। দেশের বাড়ীতে প্রায় দুহাজার লোককে ফেন-ভাতের খিচুড়ি খাইয়েছেন, কাপড় বিতরণ করেচেন কত লোককে। সম্প্রতি দুটি মিলিটারী কনট্রাক্টের কাজে শিবশঙ্কর অনেক টাকা রোজগার করেচেন। দুহাতে ঘুষ বিলিয়েও ছ লক্ষ টাকা ঘরে এনেচেন। এ বাদে খুচরো কারবার তাঁর অনেক রকম আছে, এই ছোট আপিসটাতে বসে সারা বাজারের গুপ্ত খবর রাখচেন। টেলিফোনের বিরাম বিশ্রাম নেই এক মিনিট। বাজারে তাঁর বহু চর সর্বদা ঘোরাঘুরি করচে, শেয়ার মার্কেট থেকে সর্ষে পর্যন্ত কোনো বাজারের গুপ্ত খবর ওদের জানতে বাকি নেই।

মোটের উপর শিবশঙ্করের দিন যাচ্ছে ভালো, ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হচ্ছে। আর কি অসম্ভব খাটিয়ে লোক শিবশঙ্কর। চরকির মতন ঘুরচেন এখানে ওখানে, এ আপিস ও আপিস, কত লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করচেন, কত লোক তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করচে—যে লোক এমনি নরম হয় না, তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, ছুঁচ যেখানে গলে না, সেখানে হাতী গলিয়ে

দিচ্ছেন শিবশঙ্কর,—পয়সা কি অমনি হয়?

শিবশঙ্করের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে দয়া মায়া চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি দুবলতা। যে বিচক্ষণ কারবারী সে এ সব মানবে না। কমপিটিশনের বাজার, চক্ষুলজ্জা এখানে খাটে না।

আর একটা অভিজ্ঞতা, অবিশ্যি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতা যে, ঘুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। শিবশঙ্করবাবু বলেই থাকেন—ওহে এমন লোক দেখলাম না যে পূজো পেলে খেতে চায় না। তবে বেশি আর কম। কেউ চায় ষোড়শোপচারে পূজো, কারো বা চাল কলা, কারো চিনির নৈবিদ্যি—ঢের ঢের দেখলাম হে, যেখানে ভেবেচি এর কাছে কেমন করে যাবো, এত বড় পদস্থ লোক...পূজো দাও, বাস্ সব ঠিক! সবাই সমান, তবে ওই যে বললাম, বেশী আর কম। চুরি করার সুবিধে জোটে নি যার, সেই সাধু।

বেলা একটার সময় একটি রোগা, দীর্ঘ চেহারার সাহেবি পোশাক-পরা লোক শিবশঙ্করের আপিসে এসে ঢুকলো।

শিবশঙ্কর বললেন—কি খবর? আসুন, বসুন।

—বড্ড বেশি চায়।

—কত?

—সাড়ে পাঁচ করে কাঠা।

শিবশঙ্কর বিস্ময়ের সুরে বললেন—জমি কার? ব্যাঙ্কের?

—আজ্ঞে না, মাগনলাল মুখনলাল ক্ষেত্রীর। একবার মর্টগেজ আছে। রেজিস্ট্রি আপিস সার্চ করা হয়েচে।

—বড় বেশি দর বলছে না?

—ও অঞ্চলে ওর কম দর নেই। এর পরে সাত পর্যন্ত উঠবে। ন কাঠা একসঙ্গে আর পাওয়া যায় না স্যার। আপনি কাল নিজে এক-বার চলুন—বায়নাপত্তর রেজেস্ট্রি না করলে, দু-তিনটে খদ্দের মুখিয়ে রয়েচে।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। অল্প খানিকক্ষণ কথা বলে শিবশঙ্কর ফোন রেখে সামনের লোকটিকে বললেন—য়্যাটর্নির আপিস থেকে বলচে হরিশ মুখুয্যের স্ট্রীটের বাড়ীটা এখুনি দেখতে যেতে হবে। চলুন না বাড়ীটা দেখে আসবেন—

উভয়ে মোটরে বার হয়ে সোজা হরিশ মুখুয্যে স্ট্রীটে সেই নম্বরের বাড়ীর সামনে এসে দেখলেন মিঃ ঘোষাল তাঁদের পূর্বেই সেখানে মোটর থামিয়ে অপেক্ষা করচেন।

বাড়ীর ওপরের নিচের সব ঘর, বাথরুম, দরদালান, ছাদ সব ঘুরে দেখা হলো। মিঃ ঘোষাল বললেন—মতামত দিন মিঃ সরকার।

—মতামত আর কি, নেওয়া হবে।

—তিন পার্সেণ্টের কথা স্মরণ রাখবেন। ও আমাদের একটা সর্ত। নয়তো আমারই হাতে ছুটো খদ্দের। আপনি ক্রেতা, আপনার কাছ থেকে কমিশন নেওয়া নিয়ম নয় জানি—কিন্তু এখানে অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা—

—সে যা হয় হবে। ইলেকট্রিক ইন্স্টলেশন নেই কেন? অত বড় বাড়ী—

—ছিল। ওয়্যারিং করে নিতে যা খরচ পড়বে তা তো আপনি এমনি বাদ পাচ্চেন। ওই বাড়ী কি ছুইয়ের কমে হয়—চার লক্ষ সত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজর তো উইদাউট এনি ডাউট! আপনি বলুন, এখুনি এক মারোয়াড়ী খদ্দের—

—না, না, সে কথা বলি নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

শিবশঙ্কর একাই আপিসে ফিরলেন, তখন বেলা পৌনে তিন।

আপিসের চাকর কারুয়া বললে—হুজুর, টেলিফোন ছুবার বাজিয়েছে। হামি নম্বর লিখে রাখিয়েছে।

—কই নম্বর?

—হুজুর, ঘরের টেবিলমে আছে। মনুবাবুকে দিয়ে লিখিয়ে

রাখিয়েসে। এক তো সাউথ ওয়ান ফাইভ—

শিবশঙ্কর চাকরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা—এক পেয়ালা চা জলদি তৈরি কর—

—আউর কুছ্ বাবু?

—আজ বাড়ী থেকে টিফিন আনে নি কেউ? ফল-টল?

—না হুজুর। সড়া পোচা দু আপেল হুজুরের টেবিলমে ছিল, ও হামি ফেকিয়ে দিয়েসে—ও কালওয়ালা—

—বেশ করিচিস। যা চা নিয়ে আয়—

কারুয়া অনেক দিনের চাকর; আগে শিবশঙ্করের বাড়ীতে ছিল, এখন কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ওকে আপিসে নিজের খাসকামরার চাকর রেখেছেন শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর কি খান না খান, কি তাঁর অভ্যেস, কারুয়া এ সব জানে। কারুয়ার আনীত চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে শিবশঙ্করবাবু ভাবছিলেন আরও কিছু জমির সন্ধান নিতে হবে।

জমি বড় দরকার।

এই সব অঞ্চলে বড় বড় প্লটের সন্ধানে আছেন।

শিবশঙ্কর কাগজ-কলমে ছোট্ট একটু হিসেব করে নিলেন। লাখ দুই টাকার জমি কিনে রাখতে হবে। টালিগঞ্জের দিকে কিছু জমি এখনো আছে। ব্যাঙ্কের জমি কিছু আছে লেক আর ঢাকুরে যাদবপুর অঞ্চলে।

'টাকা হোলে মাটি করো' মস্ত বড় কথা। অত বড় ইনভেস্টমেণ্ট নেই টাকার। দালালেরা নানারকম সন্ধান নিয়ে আসে। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে আছে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম খবর, দালালদের দেওয়া। শিবশঙ্করবাবু ড্রয়ার খুলে অর্ধ-অন্যমনস্ক ভাবে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালের জঙ্গল একশো কুড়ি বিঘে এক প্লটে। ধানের জমি ওই সাথে এক প্লটে সত্তর

বিঘে, মাঝখানে বড় পুকুর।

বর্ধমান জেলায় ধানের জমি নব্বুই বিঘে। বনপাশ স্টেশনের কাছে।

কুমারডি কয়লাখনির এক তৃতীয়াংশের মালিকানা স্বত্ব, বড় বাংলোঘর, ইঁদারা, ছোট বাগান একত্রে।

রানাঘাট টাউনে রেলের নিকট স্টেশন রোডের ওপর দুখানা বাড়ী, রেলের ওপারে বাইশ বিঘের সেগুন বাগান, ইঁটের ভাঁটা।

যশোর জেলায় মৌজা ধরমপুর ও মৌজা চণ্ডীরামপুর—দুইটি বড় মৌজা নীলামে উঠেচে। সামনের মাসের বারোই তারিখে যশোর সদরে নীলাম হবে। লোক পাঠিয়ে শিবশঙ্কর জেনেচেন মৌজার আদায় ভালো, একাত্তরটি জমার মধ্যে উনিশটি খাস হয়ে গিয়েচে এবং আশা আছে আরও আটটি জমা এই বছরের মধ্যেই খাস হবে। বাকী খাজনা পড়ে আছে প্রজাদের কাছে কয়েক হাজার টাকা।

হাজারিবাগ জেলায় সিংজানি-ভোজুড়ি অভ্রের খনি ও শালবন, বাংলো, ইঁদারা এবং কিছু ধানের জমি।

উল্টোডিঙির খাল ধার থেকে সামান্য দূরে ৺মহেশচন্দ্র সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ও পুকুর, বাগানে জমির পরিমাণ দশ বিঘে। কলমের আম, লিচু, ফলসা, ম্যাঙ্গোস্টিন প্রভৃতি ফলের গাছ। দোতলা বাড়ী।

অভ্রের খনির ওপর ঝোঁক বেশি শিবশঙ্করের। দু-পার্সেণ্টের অনেক বেশি আসবে টাকার ওপর। স্বাস্থ্যকর স্থান, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকাও যাবে, কলকাতায় তো যা খান হজম হয় না, লিভারের রোগে কষ্ট পাচ্চেন।

আর বাকী সব পাড়াগাঁয়ে জমিজমা, ধানক্ষেত—নাঃ ওদের কি মূল্য আছে? জমি কিনতে গেলে কলকাতায়। কলকাতার সম্পত্তির মত সম্পত্তি নেই—বাড়ী বা জমি। মহেশ সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ভালো, ফলবান গাছ অনেকগুলো, নার্সারি করবার জন্যে কেউ ভাড়া

নিতে পারে, অনেকখানি জমি—মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে দু-চার বছর পরে। দালালে বলচে আটষট্টি হাজার, তিনি বলচেন পঞ্চাশ হাজার। যদি ওটা হয়, তবে খুবই ভালো।

শিবশঙ্কর কেঁপে উঠলেন তো সেদিন। ক'বছরের কথা আর? কি ছিল শিবশঙ্করের? বারাসাতের কাছে ভবনহাটি বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানেই পৈতৃক বাড়ী। অবিশ্যি নিতান্ত গরীব ছিলেন না, সেকেলে বড় গৃহস্থ, তবে ইদানীং নামেই ছিল তালপুকুর, ঘটি ডুবতো না।

নিজের বুদ্ধিতে শিবশঙ্কর সব করেচেন। বীরের মত করেচেন, বীরের মতই ভোগ করে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর। এখনো হয় নি, লেক অঞ্চলে বড় একখানা বাড়ী করবার শখ তাঁর, কিন্তু পছন্দসই জমি পাচ্ছেন না।

তেজপুরের কাজটা যদি হাতে এসে যায়, তবে নির্ঘাত তিন লক্ষ ঘরে আসবে। হিসেব করে দেখা আছে তাঁর। এই বছরের শেষেই টাকাটা হাতে আসতে পারে, যদি বিলের টাকা গভর্নমেণ্ট এ বছরেই শোধ করে। পুজো দিলে শেষের ব্যবস্থা চটপট হয়ে যাবে। শিব-শঙ্করকে কাজ শেখাতে হবে না, ঘুঘু হয়ে বসে আছেন তিনি। অনেস্টি বলে জিনিস নেই এ বাজারে। অনেস্টি একটা মুখের কথা মাত্র। কমপিটিশনের বাজার, অনেস্টিতে হয় না। টাকা···টাকা চাই, টাকা। দুনিয়াতে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা যে পথে আসে আসুক। টাকা রোজগারের এই তো সময়। যুদ্ধের বাজারে যে যা করে নিতে পারে। কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়চে···যার বুদ্ধি আছে ধরে নাও। কিছুই এখনো রোজগার করা হয় নি। অনেক কিছুই বাকী।

কেবল একটা ব্যাপার শিবশঙ্করকে বড় চিন্তিত করে তুলেচে।

বড় ছেলে বিমান প্রায়ই রাত্রে বাড়ী আসে না। নিজের আলাদা একখানা মোটর কিনেচে। নানা রকম কথা কানে গিয়েচে শিবশঙ্করের।

ঠিক বুঝতে পারচেন না এখনও তিনি। বিমান এমন ছিল না। বড় বৌমা প্রায়ই কাঁদেন সুলেখার মুখে শুনতে পান তিনি। গিন্নি কিছু বলেন না, এজন্যে গিন্নির ওপর শিবশঙ্কর সন্তুষ্ট নন। গিন্নির প্রশ্রয় না পেলে বিমান এমন হতে পারতো না। যত নির্বোধ নিয়ে হয়েছে তাঁর সংসার।

টেলিফোন বেজে উঠে শিবশঙ্করের চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিলে।—হ্যাঁ, কে ? ও আচ্ছা—বেশ বেশ। তুমি চলেই এসো এখানে। দেরি করো না।

একটি শৌখীন বাবুমত লোক, চোখে সোনাবাঁধানো চশমা, ঘরে ঢুকলো দশ মিনিট পরে। এই লোকটি ঘরে ঢোকবার পরে শিবশঙ্কর সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের দরজার দিকে দু-তিনবার চাইলেন। লোকটি চাপা মৃদুস্বরে মিনিট দশেক কথা বলে তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক সুরে ফিরে এসে বললে—বেশ, যাই তা হোলে।

—বোসো, বোসো—

—বুঝতে পারলে না ? সামলে রাখতে বলিগে যাই! সিনেমায় আজকাল নাম করে উঠেচে ঠেলে, দেখতে পরমা রূপসী—মৌমাছির ঝাঁক কম নয়। বুঝতে পারলে না ? ঠিক আটটাতে—

বেলা ছটার পরে শিবশঙ্কর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন—শোভা সিং, চলা যাও বেহালামে। বৌমাদের লে আও। হাম ট্যাক্সিমে যায়েঙ্গে। ঠিক করে লে আও, যেন মিলিটারি গাড়ীমে ধাক্কা মৎ লাগে—

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর—বলে শোভা সিং গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিসে নানা কাজ সেরে সাড়ে সাতটার সময় শিবশঙ্কর ট্যাক্সি নিয়ে বার হোলেন। ভবানীপুরের একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। আগের শৌখীন লোকটি বারান্দা থেকে নেমে এসে বললে—এসো ভায়া, এসো—চা খাবে না ?

—আর এখন চা নয়। চলো—

—এখনো দেরি আছে। আমি কাপড় পরে নি। আসচি—

দুজনে আবার গাড়ী নিয়ে চললেন—বেলতলা রোডের পার্কের কাছাকাছি একটা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। লোকটি বললে—আমি ফোন করেছিলুম, আটটার সময় সব সরিয়ে দিও। খুব সুন্দরী, আর বয়েস উনিশের বেশী নয়। নিজের চোখেই দ্যাখো ভায়া এ শর্মার নাম গোপাল চক্কোত্তি। মাসে চারশোতেই রাজি করিয়ে দেবো—তুমি শুধু দেখে যাও—সিনেমাতে আজকাল নাম কি! যত সব চ্যাংড়া ছোকরার ভিড় সেই জন্যে—

ওপরে দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বারান্দা, ফুলের টব সাজানো। অর্কিডের টব ঝুলচে বারান্দার ছাদের প্রান্ত থেকে।

সঙ্গী লোকটি কড়া নাড়তেইও দিকের দরজা দিয়ে যে তরুণটি সিগারেট মুখে বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল—শিবশঙ্কর যেন ভূত দেখলেন তাকে দেখে।

শিবশঙ্করের সঙ্গী বললে—ওই দ্যাখো যত সব ছেলে ছোকরার মরণ—সিনেমার ইয়ে কিনা? আসল কমপিটিশন হচ্চে এদের কাছে টাকায়—সে কমপিটিশনে দাঁড়ানো চ্যাংড়াদের কর্ম নয়…ও কি! দাঁড়ালে যে? কি হোলো?

শিবশঙ্কর ততক্ষণ দম নিলেন।

যে ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, সে বিমান, তাঁর ছেলে বিমান।

ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর

চিঠিখানা পাইয়া বড়ই রাগ হইল। সকালে চা পান করিয়া সবে সেরেস্তায় আসিয়া বসিয়াছি, আর অমনি পিওন আসিল। ঘড়িতে দেখিলাম মাত্র আটটা। বলিলাম—আজ এত সকালে?

পিওন বলিল—না বাবু, সকাল আর কই। আপনার দুটো মনি-অর্ডার আছে, ভাবলাম আগে বিলি করে তবে অন্য জায়গায় যাই—একটু পরে মক্কেলের ভিড় হোলে তখন আপনি ফুরসত পাবেন না হয়তো। নিন, সই দুটো করে দিন—পঞ্চাশ টাকা আর আটাশ টাকা এগারো আনা—

মক্কেলদের টাকা অবশ্য। কোর্টের খরচ। বিজন মুহুরীকে ডাকিয়া বলিলাম—দ্যাখো তো এসমাইল বদ্দি বাদী, ফজলুল গাজি বিবাদী। কেসের তারিখটা কত?

বিজন আমাদের সেরেস্তায় অনেকদিনের মুহুরী। আমার ও আমার দাদার। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমল হইতে উহারা এখানে আছে। বিজনের বাবা ৺রামলাল চক্রবর্তী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুহুরী ছিলেন। আমাকে ও আমার দাদাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিজনের সঙ্গে বাল্যে খেলাধূলা করিয়াছি, আবার সেই বিজন আমাদের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিতেছেও আজ বাইশ বৎসর। খুব হুঁশিয়ার লোক।

বিজন খাতা দেখিয়া বলিল—২২শে আগস্ট। কত টাকা পাঠিয়েচে এসমাইল?

—আটাশ টাকা এগারো আনা—

—ফেরত দিন মনিঅর্ডার, সই করবেন না বাবু—

—কেন?

—আপনার চার টাকা আর কোর্টফির দরুন আমার কাছে ধার ছু টাকা ওর মধ্যে ধরা নেই।

—ঠিক তো?

—ঠিক বাবু, এই দেখুন খাতা—

লিখিয়া দিলাম 'রিফিউজ্‌ড'। অন্যটি সই করিয়া লইলাম, মুহুরীকে বলিলাম—টাকা দেখে নাও। ভজু চাকর আসিয়া বলিল—বাবু বাজারের টাকা—

—দাদার কাছে নিগে যা—

—তিনি বাড়ী নেই। বেরিয়ে ফেরেন নি এখনো। মা ঠাকরুন বলে দিলেন, মাছ এক সের আর মাংস এক সের লাগবে।

—মাংস আবার কি হবে আজ? আঃ, বিরক্ত করলে সব। খরচ করেই সব উড়িয়ে দিলে। রোজ মাংস। নিয়ে যা একখানা নোট—বিজন একখানা দশ টাকার নোট দাও তো ফেলে এদিকে। দুধের তিন টাকা শোধ করে দিয়ে আসবি আজ। বুঝলি?

পিওন হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনাদের বড় সংসারে আপনারা যদি রোজ মাংস না খাবেন তো খাবো কি আমরা? আপনাদের দিয়েচেন ভগবান খেতে। আপনারা খাবেন না? ও আড়াই টাকা মাছের সের হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না, তিন টাকা হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না। আমরা এক টাকাতেই মরি।

পিওন ও চাকর চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার ইঙ্গিতে বিজন পিওনকে একটা সিকি ফেলিয়া দিল। দুজন চাষীলোক ঘরে

ঢুকিয়া বলিল—বাবু ছালাম। শরৎবাবু উকিলের বাড়ী কি এডা?

—হ্যাঁ, কেন?

—একটা মকদ্দমা আছে বাবু। আরজি করে দিতে হবে একটা—

—কি কেস? কোথায় বাড়ী?

—বাবু, আমার বাড়ী রাইপুর আর এ আমার খালাতো ভাই, এর বাড়ী ন-হাটা। আমাদের একটা আমবাগান ছেল—তা আমার চাচা হাবিবর সেখ—

মক্কেল জটিল গল্প ফাঁদিবে বুঝিয়া বিজন মুহুরীকে বলিলাম—এদের কেস শোনো। আমি ততক্ষণ ডাকের চিঠিগুলো দেখে নি—খবরের কাগজখানা চোখ বুলিয়ে যাই। যাও তোমরা ওদিকে যাও—টাকা এনেচ সঙ্গে?

—হ্যাঁ বাবু।

—কত টাকা? আরজি করার ফি ছ টাকা লাগবে। সব জিনিসের দাম বেড়েচে, চার টাকায় আর হবে না।

—তা দেবো বাবু ঝা লাগে—আমাদের শুনুন তবে বাবু কি নেগগেরো, এই আমার খালাতো ভাই—

—যাও ওদিকে যাও—

এইবার ডাকের চিঠি খুলিতে খুলিতে এই চিঠিখানা পাইলাম। পড়িয়া বিরক্তি বোধ হইল। চিঠিখানা এই—

শুভাশীর্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

বাপজীবন অত্র সকল কুশল জানিবা। তোমাদের অনেকদিন কোনো সংবাদ পাই নাই। পরে লিখি যে আমাদের গৃহদেবতা শাল-গ্রামের পূজার জন্য তোমরা যে দু' টাকা এগারো আনা প্রতি মাসে পাঠাইয়া থাক, তাহা এ যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু লিখি যে বর্তমান অবস্থায় সকল জিনিস আক্রা। এক সের আলো চাউলের মূল্য মাখমহাটির বাজারে আট হইতে দশ আনা। একটি পাকা

কলা এক পয়সা মূল্যে হাটে বিকায়। এ অবস্থায় পূজার দরুন প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া না দিলে আর পারা যাইতেছে না। সকল দিকে বিবেচনা করিয়া আগামী মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া পাঠাইবে। খুড়ো মহাশয় রামধন চক্রবর্তী সম্প্রতি পায়ে আঘাত পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন জানিবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ জানাইবা।

ইতি—

সাং বাহিরগাছি — নিত্যাশীর্বাদক

বর্ধমান জেলা — শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

একটু পরে দাদা বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিজনকে বলিলাম—একবার বড়বাবুকে ডাক দাও তো। উনি বোধ হয় সেরেস্তায় গিয়ে বসেচেন।

দাদা আসিয়া বলিলেন—কি রে?

—এই দেখো হরি ভট্‌চাজ আজ দেশ থেকে চিঠি লিখেছে, ছ টাকা না পাঠালে মাসে মাসে আর সে ঠাকুরপূজো করবে না।

দাদা পত্র পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও! ঠাকুর-পূজোতেও ব্ল্যাক মার্কেট! দয়া করে তো টাকা দিচ্ছি। নামেই পৈতৃক ভিটে, কখনো যাইও নে। জ্ঞাতিরা বাড়ীতে আছে। ও টাকা তো স্টাইপেণ্ডের সমান দিচ্চি আমরা। বেশ, না পূজো করেন, না করবেন। টাকা একদম বন্ধ করে দাও সামনের মাসে। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা।

তাহাই করিলাম। দু মাস কোনো টাকা গেল না। চিঠিপত্রও নয়।

দু মাস পরে আর এক চিঠি দেশের। খুলিয়া পড়িলাম—

শুভাশীর্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

অত্র পত্রে কুশল জানিবা। পরে লিখি যে বাবাজীবন পৈতৃক গৃহদেবতা শালগ্রাম সেবার জন্য যে দুটাকা এগারো আনা করিয়া মাসে

মাসে পাঠাইয়া থাকো তাহা আজ তুই মাস বন্ধ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিলাম না; আমরা তোমাদের বংশের কুলপুরোহিত। বর্তমানে অবস্থা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা পাঠাইতেছিলে না দিলে পূজাও বন্ধ হয়, সংসারের সাহায্যও পাওয়া যায় না। অতএব টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। খুড়া মহাশয় সম্প্রতি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন! পত্রপাঠ টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ দিবা।

ইতি—

সাং বাহিরগাছি
বর্ধমান জেলা

নিত্যাশীর্বাদক
শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

দাদাকে পড়াইলাম। দাদা বলিলেন—দাও পাঠিয়ে। বদমাশি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েচে। ব্ল্যাক মার্কেট করতে এসেছে ঠাকুরপূজোয়!

সেইদিনই দাদার বড় ছেলে—শুভেন্দু কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল। তাহার পরনে কাঁচি ধুতি দেখিয়া বলিলাম—এ কোথায় পেলি রে? কত নিলে?

শুভেন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দাদার বড় ছেলে। বেশ শৌখীন। সে হাসিয়া বলিল—কাকা, কত বলো তো?

—কি জানি বাপু, আমরা বুড়ো মানুষ। ও সব আগে তো পাঁচ-ছ টাকা ছিল।

—ত্রিশ টাকা একখানা। তাও লুকিয়ে এক দোকান থেকে সন্ধ্যের পর কেনা। এমনি কোথাও মেলবার জো নেই। ভাল না? জরির আঁজি ছাখো—

এই সময়ে দাদাও আসিলেন। তুজনেই কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া শুভেন্দুর ক্রয়-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

অনুশোচনা

বালাদাস আপ্তে সকালে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ রবিবার, তাতে পাপস্বীকারকারীদের দল আর একটু পর থেকেই আসতে শুরু করবে। স্নান সেরে তিনি তাড়াতাড়ি তৈরী হতে লাগলেন ভজন-মন্দিরে যাবার জন্যে।

বালাদাস আপ্তে কংকন প্রদেশের টুস্যুঘাট ও পানজিম অঞ্চলের একজন নাম-করা লোক। গোয়া থেকে যাতায়াতের বড় সড়কের ওপর সেণ্ট জেভিয়ারের যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য মন্দির অবস্থিত, বালাদাস সেখানকার সহকারী পুরোহিত, সাধারণ উপাসনা করেন না বড় একটা, রবিবার সকালে পাপস্বীকার গ্রহণ করেন ও বিধি অনুসারে দণ্ড দেন। বালাদাসের পবিত্রতার জন্যে সকলে তাঁকে খুব মানে, ভয়ও করে। কনফেশন্যালের ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি দিয়ে মস্ত বড় জনারের ক্ষেত আর নীচু পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর দৃশ্য দেখ্‌তে দেখতে অপরাধী ভক্ত এক একবার যখন বালাদাসের দীর্ঘ দাড়ির দিকে চায়, তখন সত্যই নিজেকে সে

ঘোর পাপী ও অসহায় মনে না করে পারে না।

বালাদাস জর্ডনের পবিত্র জলের আধার থেকে নিজে একটু জল মাথায় দিয়ে ক্যাম্বিসের চটের মত লম্বা গাউন পরে সেণ্ট জেভিয়ারের ধর্মমন্দিরের ঘুলঘুলি-জানালায় গিয়ে বসেন টুলের ওপর। গত বিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন তিনি। তার আগে গোয়ার একজন মেসন্ ব্যবসায়ীর নকলনবিশ ছিলেন।

খুব সকালে প্রথমেই এসেছে একজন চাষী লোক।

বালাদাস তাঁর বাঁধা কাজ কলের মত করে যান। চাষী লোকের মাথায় জর্ডনের জল ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ল্যাটিন মন্ত্র ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করে চলেন—

আউট ননকমিটিস্ সনকোমিটিস্ ও ডেলা জেস্থ
ননকমিটিস্ সনকোমিটিস্ ও ইমিড ত্রিস মারি
হিপোক্রিটিএ নিহিল স্যালভিটর এ আউট—

তার পর গ্রাম্যকৃষককে জিজ্ঞেস করেন গম্ভীরস্বরে—কি কি দোষ বলিয়া যাও। পারত্রিকের সভায় ভগবান সিংহাসনে আসীন। দেবদূত-গণ ভেঁপু বাজাইয়া শেষ বিচারের দিন তোমার কৃত সমুদয় পাপরাশি সকলের কাছে প্রচার করিতেছে। তুমি কি কিছু লুকাইয়া রাখিতে চাও?

সংযত সাধুভাষার বাক্যে চাষা ভীত ও স্তব্ধ হয়ে পুরোহিতের মুখের দিকে চেয়ে বলল—কিছু লুকোব না হুজুর। সোমবার সন্দেতে, সলোমন বালকৃষ্ণ যে কুমড়োর ক্ষেত করেছে পাশেই, সেখান থেকে দুটো কুমড়োর জালি না বলে নিয়ে—

বালাদাস ধমক দিয়ে বললেন—বল চুরি রূপ মহাপাপ—

—আজ্ঞে, চুরি রূপ মহাপাপ করেছি। মঙ্গলবার কিছু নেই। বুধবার—

—মঙ্গলবার কিছু নেই? ভেবে দেখ। প্রত্যেক অস্বীকৃত পাপের

জন্মে সেণ্ট জেভিয়ারের পবিত্র বেদীতে স পাঁচ আনা—

—মেরী মাতার দোহাই হুজুর, মঙ্গলবার আর কিছু নেই।

—আচ্ছা বলে যাও। বুধবার—

—আমার ক্ষেতের খাম-আলু সাস্তারা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল বুরুথ টুডু আর তার ছেলে সল্ টুডু, তাদের ঢিল ছুঁড়ে পা ভেঙে দিয়েছি।

—পা ভেঙে ?

—হ্যাঁ হুজুর। পা একেবারে ভেঙে। মিথ্যে কথা বলব কেন ?

—আর তুমি যখন অপরের ক্ষেত থেকে চুরি করলে তখন বুঝি পাপ হল না ?

—আজ্ঞে—

—বলে যাও। বৃহস্পতিবার! পবিত্র সেণ্ট টেরেসা বোজার পবিত্র স্মৃতিতে পূত বৃহস্পতিবার।

পুরোহিত হাঁটু গেড়ে বসে উক্ত সেণ্ট টেরেসার উদ্দেশে আভূমি প্রণাম করলেন। সেও তাঁর দেখাদেখি তাই করলে। তার পর বললে— হুজুর, বৃহস্পতিবার একজনের ধার শোধার কথা ছিল—দিই নি!

—ইচ্ছে করে ? মনে ছিল ?

—হ্যাঁ হুজুর। টাকাটা হাতছাড়া করতে কষ্ট হচ্ছিল।

—হুঁ! ধার করবার বেলা মনে থাকে না সেসব ? টাকা শোধ দিয়েছ ?

—না হুজুর।

—আত্মপাপ-শোধনকারীদের উচিত পাপস্বীকারের দিনই গির্জা থেকে ফিরে গিয়ে পূর্বের ত্রুটি সংশোধন করা। আজই টাকা শোধ দেবে। তারপর ?

—তারপর শুক্রবার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে বলেছিলাম, তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও—

—শনিবার ?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—বল।

চাষা দুবার ঢোঁক গিলে বলল—আজ্ঞে ব্যাপারটা একটু—

—বল।

—আজ্ঞে ও পাড়ার মঙ্গলদাসের শালী এসেছে পানজিম থেকে। তাকে দেখবার জন্যে, রাস্তার ইঁদারার পাশে যখন মেয়েরা চান করছিল, তখন বড় ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে দেখছিলাম।

বালাদাস দুই গালে হাত দিয়ে বললে—কি সর্বনাশ ! কেন ?

—আজ্ঞে তা যখন বলতেই এসেছি তখন বলব। মঙ্গলদাসের শালী নামকরা সুন্দরী পানজিমের। সেখানে কী নাচঘরে কাজ করে। অমন গাইতে নাচতে কেউ জানে না এ দেশে। গরবা নাচ খুব ভাল নাচে। খুব ভাল নাচ, সেবার এসে নেচে খুব নাম করে গিয়েছিল সে।

বালাদাসের অস্পষ্ট মনে পড়ল শুনেছিলেন বটে পানজিমের একটি সুন্দরী মেয়ে গরবা পরবে হিন্দুদের উৎসব-দিনে বটতলায় অদ্ভুত নাচ নেচেছিল।

তিনি ভ্রুকুটি করে বললেন—হুঁ। বড় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যে ! ক'বার দেখেছিলে।

—আজ্ঞে তা চার বার।

—চার বার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। মিথ্যে কথা কেন বলব।

—না, তুমি সত্যাগ্রহী পল। মেয়েটি কত বড় বললে ?

—আজ্ঞে, তা যুবতী। লেখাপড়া জানে। মঙ্গলদাসের সংসারের অর্ধেক খরচ তো সেই পাঠায় পানজিম থেকে হুজুর।

—কি নাম ?

—সখীবাই।

—আচ্ছা যাও।

চাষা চলে গেল।

নিজের অপরাধের ভারে তার মন এত ভারাক্রান্ত যে বাড়ীতে গিয়ে সে রাঙা মাদ্‌সা চালের ভাত আর খামআলুর তরকারি খেতেই পারলে না। কংকন উপকূল গোধূম উৎপন্ন করে না। ভাদ্রমাসে জনার আর এই মাদ্‌সা ধান উঁচু জমিতে জন্মায়—অন্য নীচু জমিতে হৈমন্তী ধান। মাদ্‌সা ধান ষাট দিনে পাকে বলে গরীব চাষীরা অর্ধেক জমিতে এর চাষ করে, সকালে উঠে ঐ ধানের রাঙা মিষ্টি ভাত পেট ভরে খেয়ে মাঠের কাজে বেরিয়ে যায়।

দুপুর ঘুরে গেল। মাঠে বসে বসে চাষা ভাবলে কাজটা খারাবি হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সেজন্য বকুনিও যথেষ্ট খেয়েছে সে মাননীয় পুরোহিত বালাদাসের কাছে।

তবে একটা কথা।

সখীবাই এখানে চিরকাল থাকতে আসে নি।

তিন চার দিন পরে পানজিমে চলে যাবে। যাবেই।

আজ না হয় সে জনার ক্ষেতের কাজ শেষ করে বিকেলে ফেরবার পথে সোজা বাড়ী না গিয়ে ওপাড়া দিয়ে একটু ঘুরে সখীবাইকে আর একবার দেখে যাবে এখন।

ও রকম মেয়েছেলে এদিকে হর-হামেশা বড় একটা আসে না। না হয় এই অপরাধের জন্যে সে আগামী রবিবারে বাতি দেবে সেণ্ট জেভিয়ারের দরগায়। পুরোহিত কিছু জরিমানা করবেন একই অপরাধ দুবার করবার জন্যে।

একটাকা স পাঁচ আনা। তা দেবে সে। গোয়ার পাইকারদের কাছে এক গাড়ি কুমড়ো বিক্রি করলে উঠে আসবে এখন ও পয়সা।

কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে সে গুটি গুটি চলল মঙ্গলদাসের পাড়ার দিকে আস্তে আস্তে। সে ইঁদারার অদূরবর্তী বড় ডুমুর গাছটার

আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। ডুমুরের যে ঝাড় ঝাড় কাঁদি নেমেছে বৃদ্ধ মহা-পুরুষদের দাড়ির মত, তারই ওপাশে কে যেন একজন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে না?

—কে রে?

চাষা গুঁড়ির এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে গিয়ে দেখলে—ক্যাম্বিসের চটের গাউন পরে লম্বা চুলদাড়ি কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে ডুমুর ঝাড়ের তলায় চোরের মত দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বালাদাস পুরকোয়াস আপ্তে, পুরোহিত।
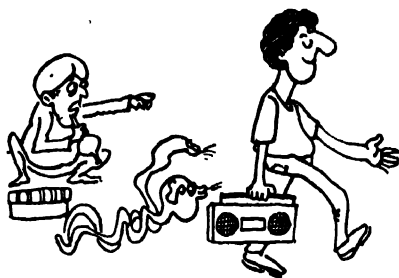
পথিকের বন্ধু

মহকুমার টাউন থেকে বেরুলাম যখন, তখনই বেলা যায় যায়।

কলকাতা থেকে আসছিলাম বরিশাল এক্সপ্রেসে। বারাসাত স্টেশনে নিতান্ত অকারণে (অবশ্য যাত্রীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) উক্ত বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট কেন যে দাঁড়িয়ে রইল দারুব্রহ্মবৎ অনড় অবস্থায় তা কেউ বলতে পারলে না। গন্তব্যস্থান বনগাঁয়ে পৌঁছে দেখি রাণাঘাট লাইনের গাড়ী চলে গিয়েচে।

বেলার দিকে চাইলাম। বেশ উঁচুতেই সূর্যদেব, লিচুতলা ক্লাবে খানিকটা বসে আড্ডা দিয়ে চা খেয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেও এই পাঁচ মাইল পথ সন্ধ্যার আগেই অতিক্রম করতে পারা কঠিন হবে না। রামবাবু, শ্যামবাবু, যদু ও মধুবাবু সবাই বেলা পাঁচটার সময় ক্লাবে বসে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বললেন—এই যে বিভূতি, এসময় কোত্থেকে ?

—কলকাতা থেকে।

—বাড়ী যাবে ? ট্রেনে গেলে না ?

—ট্রেনটা ফেল হয়ে গেল, বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট লেট।

—এসো, খুব ভাল হয়েছে এক্সপ্রেস লেট হয়ে। বোসো চা খাও।

তারপর গল্পগুজবে (যার বারো আনা পরনিন্দা) সময় হু হু করে কেটে গিয়ে কখন যে গোধূলির পূর্বমুহূর্ত উপস্থিত হয়েচে, তা কিছু বলতে পারি নে। যেতে হবে এখনো অনেকটা রাস্তা, আর দেরি করলে

পথেই অন্ধকার হয়ে যাবে, বৃষ্টিও আসতে পারে, কারণ বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বড় রাস্তায় উঠে সত্যিই দেখলাম আড্ডা দিতে গিয়ে সময়ের আন্দাজ বুঝতে পারি নি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম, পশ্চিম আকাশে মেঘ করে আসচে।

চাঁপাবেড়ে ছাড়িয়েচি, রাস্তায় জনমানব নেই, পথের তুপাশে ঘন জঙ্গলে পটপটির ফুল ফুটেচে, গন্ধ ভেসে আসছে জোলো বাতাসে, শেয়াল খস্ খস্ শব্দ করে চলে গেল পাতার ওপর দিয়ে দিয়ে, বিলিতি চটকা গাছের ডাল বেয়ে ঝুলে পড়েচে মাকাললতা। কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে বেশ লাগচে এই নির্জনতা।

চাঁপাবেড়ের পুল ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েচি, এমন সময় দেখি একটি লোক কাঁধে বাঁক নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্চে।

আমার পায়ের শব্দে সে চমকে পিছন ফিরে আমার দিকে চাইলো।

ওকে এপথে একা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েচি। এ বনপথে এ সময় কেউ একা বড় একটা হাঁটে না।

বললাম—কোথায় যাবি?

—আজ্ঞে, গোপালনগরে।

—বাঁকে কি রে?

—দই আছে।

—এত দই কি হবে?

—নিবারণ ময়রার বাড়ী বায়না আছে। তেনাদের বাড়ী আজ খাওয়ান দাওয়ান।

—তোদের বাড়ী কোথায়? দই আনচিস কোথা থেকে?

—আজ্ঞে, বেনাপোল থেকে।

—বলিস কিরে, এই দশ মাইল দূর থেকে দই আনচিস! তা এত দেরি করে ফেললি কেন?

লোকটার কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছিল ও আমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে

বাঁচলো এই সন্দেবেলা। একা যেতে ওর নিশ্চয় ভয় করছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে গল্প জুড়ে দিলে কেন তার দেরি হল দই নিয়ে রওনা হতে। ওদের একটা গোরু হারিয়ে গিয়েছিল আজ পাঁচ-দিন। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আজ দুপুরের পর হিজোল-তলার বাঁওড়ে সেই গোরুকে চরতে দেখা গেল। তারপর ওরা দল বেঁধে বেরুলো গোরু আনতে। গিয়ে দেখে বাঁওড়ের ধারে একটা লোক বসে আছে, তার কাছেই ছ'টা গোরু একসঙ্গে চরচে। সবগুলোই বিভিন্ন গ্রামের হারানো গোরু, ক্রমে জানা গেল। লোকটা ত ওদের দেখেই দৌড়—ইত্যাদি।

এইবার বেশ সন্দে হয়ে এসেচে।

বাঁশ-আমবনের ভেতরে ভেতরে ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।

সামনে একখানা শুকনো কাঠ উঁচু চটকা গাছের মাথা থেকে ভেঙে পড়তেই ও চমকে উঠে বললে—ও কি? আমি হাসি চেপে বললাম—চটকা গাছের ডাল। লোকটা আশ্বস্ত বললে—ও।

—তোমার নাম কি?

—নিধিরাম।

—বাড়ী?

—কটক জিলা।

—সত্যি? তুমি তো বেশ বাঙালীর মত কথাবার্তা বলচো।

—তা হবে না বাবু? বেনাপোলের কাছে কাস্তান্দিয়াতে আমার পনেরো বছর কেটে গেল। ওখানে আমার গোরুর বাথান। কুড়িটা গাইগোরু পনেরো-ষোলটা বক্না বাছুর, মস্ত বাথান। রোজ আধ মণ দুধ হয়। এঁড়ে বাছুর আমরা রাখিনে, শুধু বক্না বাছুর রেখে দিই। এঁড়ে বিক্রী করে ফেলি বাবু—

লোকটা একটু বেশি বকে। আমাকে পেয়ে ওর বকুনি আর থামতে চায় না। একা যাচ্ছিল, আমায় পেয়ে ও ভারি খুশি হয়েচে, ভরসা

পেয়েচে, এই সন্দেবেলা।

বললে—বৃষ্টি আর হল না বাবু, কি বলেন?

—সেই রকমই তো দেখচি।

—এবার বড় দুবচ্ছর। আমন ধানের রোয়া হল কই? বীজপাতা ছিল দু কাঠা ভুঁই। সে বীজ লালচে হয়ে আসচে। ওই দেখুন, কেমন মেঘ করে আসছিল, আবার ফর্সা হয়ে এল! এবার আমাদের এদিকে খুব কম বৃষ্টি হয়েচে। আমন ধানের রোয়া হয়নি, চাষামহলে হাহাকার পড়ে গিয়েচে, ধানের দর ছিল চারটাকা মণ। এখন উঠেচে সাড়ে সাত টাকা মণ? গরিব দুঃখী লোকেরা এর মধ্যে উপোস শুরু করে দিয়েচে।

আমায় আবার বললে—গোরুগুলো অনেক কষ্ট করে মানুষ করা। এবার বিচুলি অভাবে মারা পড়বে বাবু।

—কাঁচা ঘাস কেটে খাওয়াবে। বর্ষাকালে কোনো গোরু বিচুলি খায়? সবই কাঁচা ঘাস খেয়ে বাঁচে।

—বেত্‌না নদীর ধারে আগে আগে কত কাঁচা ঘাস পাওয়া যেতো, এখন সব আঁটি বেঁধে এনে এনে বনগাঁ শহরে বিক্রী করে। শহুরে বাবুরা চার আনা চোদ্দ পয়সা এক আঁটি কিনচে। আমাদের গোরুর ঘাস নিয়েই মুশকিল। ওটা কি বাবু?

এইবার লোকটা চমকে উঠে যেন আমার গা ঘেঁষে এসে থমকে দাঁড়ালো।

আমি বললাম—কই, কি?

—ওই যে সাদা মত?

চেয়ে দেখলাম, কিছুই না। মাকাল লতার মোটা সাদা লতা গাছের ডাল থেকে ঝুলে দুলচে অন্ধকারে। লোকটা দেখচি বিষম ভীতু।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগলো।

আমায় ও বললে—বাবু, আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি একটু গিয়ে ডানদিকের রাস্তায় নেমে যাবো। ওখানেই আমার গাঁ।

—গোপালনগর এখন কতদূর আছে?

—তা দেড় মাইল।

—পথে কোনো ভয়-টয় নেই তো?

আমি জোরে ঘাড় নেড়ে বললাম—না, ভয় কিসের। এ অঞ্চলে বাঘ-টাঘ নেই। বুনো শুয়োরও নেই। সে বললে—আমি বাঘের কথা বলিনি বাবু—বলি এই—সন্দেবেলা আবার নাম করতে নেই—সেই তাঁদের—

—ও, ভূতপ্রেতের?

—ও নাম করবেন না সন্দেবেলা। রাম রাম রাম রাম! ও নাম কি করতে আছে এ সময়? রাম রাম রাম রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে বললাম—ও, বুঝিচি। তবে একটা কথা, যখন তুমি বিদেশী লোক, তখন তোমাকে সব খুলে বলাই ভালো।

—কি বাবু?

—দাঁড়াও এখানে। আমি তো এখুনি নেমে যাবো, তুমি একা যাচ্চ এতটা পথ—অন্ধকারে—পথে জনপ্রাণী নেই—। আমার বর্ণনার বহর শুনে লোকটা আরও আমার দিকে ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে—তারপর বাবু?

—তারপর আর কি, তোমাকে বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু যখন জিগ্যেস করলে তখন না বলাটা তো ঠিক নয়। বিশেষ করে একা যখন যাচ্চ। সঙ্গে নেই লোক। ওই যে একটা সাঁকো আছে রাস্তার ওপর বনের পাশে, ওই সাঁকোটা বড় খারাপ জায়গা।

—কেন বাবু?

—ও জায়গাটাতে ভূত—মানে ওঁরা সব আছেন কিনা! পাশে যে

বড় বাগান, ওটার নাম গলায়-দড়ের আমবাগান। বড্ড খারাপ জায়গা। অনেকদিন আগে তখন আমি ছেলেমানুষ, একবার একজন এই তোমার মতই বিদেশী লোক একা যাচ্ছিল গোপালনগরে, সন্দের পর। তার পর-দিন সকালবেলা দেখা গেল কিসে তার ঘাড়টা ভেঙে মেরে ফেলে রেখেচে সাঁকোর তলায়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। কথাটা তোমায় বলা উচিত নয়, তবে যখন জিগ্যেস করলে, তখন চেপে রাখাও তো উচিত নয়। একটা বিপদ হতে দেরি লাগে না, তখন তুমি বলতে পারো বাবু, আপনি জেনে-শুনেও আমায় বলেন নি কেন। সন্দের পর কেউ ও পথে যায় না। প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। আজ বছর দুই আগে এক রাখাল ছোঁড়া দিনদুপুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সাঁকোর তলায়। যাক সে, তুমি রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও, কোনো ভয় নেই।

—বাবু, আপনি কি নেমে যাবেন?

—হ্যাঁ, আগে আমার গাঁয়ের রাস্তা নেমে গেল। আমি এইবার চলে যাবো।

—তাই তো বাবু, একা আমি কি করে যাবো?

—রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে? কপালে মৃত্যু থাকলে কেউ সামলাতে পারে না। না থাকলে কেউ মারতে পারে না। রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও। দাঁড়াও, আজ আবার তিথিটা কি? চতুর্দশী। তিথিটা ভালো নয়। অমাবস্যে, চতুর্দশী, প্রিতিপদ এই তিথিগুলো খারাপ।

—কেন, কেন বাবু?

—সে আর তোমাকে বলে কি হবে? তুমি সন্দের অন্ধকারে একা রাস্তার ওপর—যেতে হবে এখনো তোমায় এক ক্রোশ পথ। ক্রমশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আসচে। তবে তোমায় বলা আমার উচিত—বিদেশী লোক, তোমায় সব কথা খুলে না বলাটাও ঠিক নয়। একটা

বিপদ হোতে কতক্ষণ ? তখন তুমি আমায় দোষ দিতে পারো। এই সব তিথিতেই ভূত প্রেত—পিশাচ ব্রহ্মদত্যি—

লোকটা বলে উঠলো—রাম রাম রাম রাম—ও সব নাম করবেন না বাবু—

—মানে ওঁরা সব বার হয়ে থাকেন কিনা—

—তাই নাকি ? তবে তো—

—আবার কি জান, এই চতুর্দশী তিথিতে গলায় দড়ি দিয়ে অপমৃত্যু ঘটেছে এমন ভূতেরা বার হয়। আমি একবার বড় বিপদে পড়েছিলুম—

লোকটা আড়ষ্ট সুরে বললে—কি বাবু ?

—একটা শ্মশানের ধার দিয়ে সেবার যাচ্ছিলাম। সেও এই ভূত-চতুর্দশী তিথি। দেখি যে অন্ধকারে গাছের ডাল থেকে কি একটা যেন ঝুলচে—কাছে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে-মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে আর হিঃ হিঃ করে হাসচে—

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে—কি সর্বনাশ !

—যাক্, ওই আমার রাস্তা নেমে গেল। আমি চললাম এবার। যাও তুমি, একটু সাবধানে যাও, সাবধানের মার নেই।

কথা শেষ না করেই আমি আমাদের গ্রামের পথে নেমে পড়লাম।

ও কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে—বাবু, আমাকে একটু এগিয়ে নিয়ে সাঁকোটা পার করে দ্যান যদি—

আমি শিউরে বলে উঠি—আমি ? আমার কম্ম নয়। আমাকে তার-পর এগিয়ে দেবে কে ? বাবারে, প্রাণ হাতে করে যাওয়া ওসব জায়গায়! একে আজ ভূতচতুর্দশী—

—রাম রাম রাম রাম !

—তুমি চলে যাও একটু জোর পায়। আবার রাস্তাও তো কম নয়, তোমাকে যেতেও হবে একমাইল দেড়মাইল রাস্তা আর এই অন্ধকার! আচ্ছা চলি—তুমি বিদেশী লোক, জিগ্যেস করলে তাই এত কথা বলা।

নইলে কি দরকার ?

আমাদের রাস্তায় নেমে কয়েক পা মাত্র এগিয়েচি, লোকটা দেখি ডাকচে—বাবু, বাবু, একটা কথা শুনুন—ও বাবু—

পিছন ফিরে দেখি কাঁধের বাঁকটা একটি শিশুগাছের তলায় নামিয়ে দাঁড়িয়েচে।

বললাম—কি ?

—দইগুলো নিয়ে আমি এখন কি করি বাবু ?

—কি আর করবে ? বায়না রয়েছে, একমুঠো টাকা। দিয়ে এসো। রাত হয়ে গিয়েচে, ওদের খাওয়ানোর সময় হল। রাম ব'লে এগিয়ে পড়ো—সাবধানে যেও—। আর কোনো কথা না বলে আমি হন হন করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

ও শুনলাম আবার ডাকচে—ও বাবু, ও বাবু—শুনে যান—একটা কথা, ও বাবু—! দূরে ওর গলার সুরটা যেন আর্তনাদের মত শোনাচ্ছিল।

কলহান্তরিতা

শ্যাম সরকার আমাকে ডেকে বললে—শোন বাবা, একটু বোসো।

হাট-বাজার করে ফিরছিলাম, বেলা হয়েচে, বেশি বসবার সময়ও নেই।

শ্যাম সরকার বুড়ো হয়েচে, বড্ড বকে। আমার এখন ওর বকুনি শুনবার সময় নেই। তবুও বললাম—কাকা ভাল আছেন?

শ্যাম সরকার ওর দোতলা বাড়ীর সামনে বসে মালা জপ করছে। আমি ওকে মালা জপ করতে দেখচি এইভাবে বসে আজ ত্রিশ বছর। লোকটা ঝানু বিষয়ী, টাকা ধার দিয়ে তার সুদ থেকে চালায়। আবার গীতার ব্যাখ্যাও করতে শুনেচি ওকে। এদিকে মামলা মোকদ্দমা করতে ছাড়ে না, তাও দেখতে পাই।

শ্যাম সরকার বললে—এসো বাবা, বোসো। চোখেও আজকাল খুব ভাল দেখি নে—একটা কথা শোনো। আমার একটা উপায় করে দাও বাবা—

—কি উপায় কাকা? কিসের উপায়?

আমার ছেলে বিষ্টু বড় বদ হয়ে উঠেছে। দিন রাত কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া। আমায় বলে, বিষয়-সম্পত্তির ভাগ দাও। বসে বসে খাবে কেবল। কোন কাজ করবে না। ওবেলা তো আমায় মারতে এসেছিল। এর একটা—

—কাকীমা কিছু বলেন না ?

—তাহলে আর ভাবনা ছিল কি ? সেও ছেলের দিকে। দু'জনে মিলে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। এর একটা বিহিত করো বাবা—

—আমি এর কি বিহিত করবো বলুন। বিষ্টু আমার কথা কি শুনবে ? মিছে মিছে অপমান হওয়া।

—অপমান করলেই হোল অমনি ? তোমরা হলে সোনার চাঁদ ছেলে —তোমরা এর একটা প্রতিকার করতে পারবে না ?

—মাপ করবেন কাকা। আপনাদের গৃহবিবাদের মধ্যে আমাদের থাকবার দরকারই বা কি ? ও আমার দ্বারা হবে না।

এ দিনটি কোনো রকমে নিস্তার পেয়ে এলাম বটে কিন্তু পরদিন আবার শ্যাম কাকা আমায় ধরেচে রাস্তায়। বিকেলে তাস-খেলার আড্ডায় বেরুচ্ছি, শ্যাম কাকা বললেন—শোনো বাবা—

—এখন একটু ব্যস্ত আছি কাকা। শুনব এখন অন্য সময়—

—ওই বাবাজি তোমাদের দোষ। একটুখানি দাঁড়াও না ? এই ছ্যাখো তোমার খুড়ীমা আমায় আজ কি করে মেরেচে—

—মেরেচেন ? খুড়ীমা !

—মিথ্যে কথা বলচি বাবা ? হয় না হয় তুমি ললিতকে জিজ্ঞেস ক'রে ছ্যাখো। আমায় রক্ষে কর বাবা। আমায় আজ খেতে দেয় নি, দুটো ভাতও দেয় নি। আমায় বাঁচাও—

কথা শেষ ক'রে শ্যাম কাকা আমার হাত দুটো খপ করে ধ'রে ফেললেন।

অগত্যা শ্যাম সরকারের বাড়ীর মধ্যে আমায় ঢুকতে হোল।

ঢুকে বললাম—ও খুড়ীমা—

শ্যাম কাকার বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলো ঘর। ওদিকে শান-বাঁধানো বড় রোয়াক, টিউবওয়েল, পাকা রান্নাঘর, গোয়াল—বেশ সম্পন্ন

গৃহস্থের গৃহস্থালির সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্বত্র। কিন্তু ওদের সংসারে যে শান্তি নেই, তা এ গ্রামে সকলেই জানে। এদের বাইরের ঠাট যেমনই হোক, ভিতরে অনেক পরিমাণে অন্তঃসারশূন্য।

খুড়ীমা তালের বড়া ভাজবেন বলে তোড়জোড় করছিলেন, কারণ হাতে তালের গাঢ় হলদে রস মাখা; রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে খুড়ীমা রোয়াকে দাঁড়ালেন—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, লাল-চওড়া-পাড় শাড়ী পরণে, পায়ে আলতা, মাথায় একঢাল চুল, মুখশ্রীতে প্রৌঢ়া সুন্দরীর গম্ভীর স্থির সৌন্দর্য। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কে রমেশ? কি বাবা?

আমতা আমতা ক'রে বললাম—এই খুড়ীমা, বল্‌চি কি—

কথা বেধে যেতে লাগলো। খুড়ীমার ঝঙ্কার ও দাপটের খ্যাতি এ গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়ে জুড়ে বসেচে অনেক কাল থেকে। সকলেই জানে কি রকম চিজ্ তিনি। এই সন্ধোবেলা শেষে কি গোলমাল বাধাবো? ভাল হাঙ্গামাতেই পড়েছি! বেশি পরোপকারের প্রবৃত্তি থাকলেই এ রকম বিপদে পড়তে হয়, এ আমি লক্ষ্য ক'রে আসচি বরাবর থেকে।

খুড়ীমা রুক্ষ নীরস কণ্ঠে বললেন—আমার আবার সময় নেই। তালের গোলা মাখচি দেখতেই পাচ্চ বাপু। কি বলবে বল—

খুড়ীমা ঝানু মেয়েমানুষ, নিশ্চয়ই বুঝেচেন আমি কি বলবো।

শক্তি সঞ্চয় ক'রে বললাম—কাকা নাকি আজ খান নি—ওঁর এ বয়সে ঠিক সময়ে খেতে না পেলে—

খুড়ীমা আমার সামনে এসে হাত নেড়ে বললেন—ওই বুড়ো বদমায়েশ লাগিয়েচে বুঝি? তা লাগিয়ে আমার কি করবেন শুনি? গাঁয়ের লোকে কি চাল কেটে আমায় উঠিয়ে দেবে গাঁ থেকে? হ্যাঁ, খেতে দিই নি! বুড়োর বচনে পিত্তি জ্বলে যায়, সে বচন যদি শোনো বাবা, তখন তুমিও বলবে যে হ্যাঁ, বচন বটে একখানা। আমার ওই ধুলোগুঁড়োটুকু নিয়ে সংসার করচি বাবা, আমার শিব রাত্তিরের শল্‌তে টিম্ টিম্ ক'রে

জ্বলচে, ওই আমার বিষ্টু—ওকে বুড়ো বলে কি না, পয়সা না রোজকার করিস তো বাড়ী থেকে বেরো। তুমিই বলো দেখি বাবা, বিষ্টু বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবে, আর আমি বসে থেকে ওই বুড়ো ভূতকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াবো ? তাই বলি ছাই খেতে দেবো তোমাকে। তাই খেতে দিই নি—সোজা কথাই তোমাকে বললাম, এখন তুমি আমার কি করবে করো—

আমি জিভ কেটে বললাম—সে কি কথা খুড়ীমা, ছি ছি—আমি আপনার সন্তানের মত—এ সব কথা আমাকে—

খুড়ীমা বললেন—বোস বাবা, তালের বড়া ভাজচি, খেয়ে যাও গরম গরম—

আমি বললাম—সে হবে এখন। কাকাকে আপাততঃ কিছু খেতে দিন, ওঁর খাওয়া হয় নি সারাদিন। ডেকে আনবো ?

খুড়ীমা মুখ ঘুবিয়ে বললেন—না। অত আতি্যস্যূয়ো তোমার করবার কোন দবকার দেখি নে তো !

—দরকার বেশ দেখা যাচ্চে, খুড়ীমা! কাকাকে ডেকে আনি, দেখুন—বুড়ো মানুষ, ওরকম করবেন না। কিছু খেতে দিন ওঁকে।

—আচ্ছা, একটু পবে যেও। তালের বডা একখোলা নামাই—পোড়ারমুখে না হয় গরম গরম দু'খানা দেবেন এখন বুড়ো, যমের অরুচি—

—ছি খুড়ীমা, অমন ক'রে বলা আপনার উচিত হয় ? বলবেন না ওরকম।

পিছনের দিকে দোরের কাছে কখন শ্যাম কাকা এসে হুঁকো হাতে দাঁড়িয়েছেন, টের পাই নি। তিনি অমনি দোর থেকে বলে উঠলেন—শুনচো তো বাবাজি ? শোনো, নিজের কানে শুনে যাও তোমার খুড়ী-মার বচন—মধু ঢেলে দিচ্ছে একেবারে কানে। ওই মাগী যদি এ ভাবে—সংসার উচ্ছন্ন দিলে ওই বদমাইশ মাগীই তো—

এর পর উভয়ে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। আমি কিছুক্ষণ উভয়-পক্ষকে নিরস্ত করার বৃথা চেষ্টার পরে সরে পড়বার যোগাড় করছি, এমন সময় খুড়ীমা ডাকলেন—কোথায় যাও বাবা? দাঁড়াও, তালের বড়া খেয়ে যাও—

আর তালের বড়া! যে কাণ্ডটা দুজনে সন্ধ্যেবেলা বাধালেন, ভাবলাম একবার বলি!

মুখে বললাম—আচ্ছা খুড়ীমা, আমি বসচি। আপনারা দয়া ক'রে একটু চুপ করবেন?

খুড়ীমা আর কোন কথাটি না বলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

শ্যাম কাকা আমাকে চুপি চুপি বললে—তুমি একটু বলো বাবাজি, দু'খানা তালের বড়া যেন আমাকেও দেয়—বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি ততক্ষণ হরিনামটা সেরে নেই—সন্দে হয়ে এল—

আমায় কিছু বলতে হোলো না। খুড়ীমা দুটো কাঁসার জাম-বাটিতে তালের বড়া নিয়ে এসে বললেন—অমুক বুড়ো (খুড়ীমার ব্যবহৃত বিশেষণটি অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট বলে এখানে উল্লেখ করা গেল না) কোথায় গেল?

—আজ্ঞে তিনি সন্ধ্যে আহ্নিক করতে গেলেন—

—ওর মুণ্ডু আহ্নিক। ডেকে দ্যাও, খেয়ে তিনি আমার মাথা কিনুন—

আমি ডেকে আনলাম বাইরে ঘর থেকে।

খুড়ীমা কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে দিলেন শ্যাম কাকাকে ডেকে আনবার পরে। আমার অস্তিত্বই যেন তিনি ভুলে গেলেন। শ্যাম কাকাকে তালের বড়া খাওয়াতেই তাঁর সারা মন যেন ঢেলে দিলেন। তবে সম্বোধনের বাণী মধুর ছিল না, মধুর তো দূরের কথা, শিষ্ট বা ভদ্রও ছিল না।

নমুনা কিছু নীচে দেওয়া গেল—

—গেলো—যমের অরুচি—গেলো। তা ভালো হয়ে বোসোও না হয়? কোন্ মড়ার ঘাটে তোমার জন্যে বাঁশ তৈরি রয়েচে যে আজ সারা দিন বাইরে বসে থাকা হয়েছিল শুনি? আমার তো বড্ড দোষ, দেশ পিরথিম তো ছেয়ে ফেললে আমার অপযশ গেয়ে। এখন তারা এসে তোমায় গিলতে দিক দেখি? বলি মুখে বলতে সবাই আছে, দুটি বেলা পিণ্ডি সেদ্ধ করবার বেলা কোন্ যম তোমার আছে শুনি? দাঁড়াও, আর দু'খানা গরম গরম এনে দিই—তাড়াতাড়ি কিসের শুনি? বলে সেই এক কড়ার মুরোদ নেই, নাম গঙ্গারাম—ইদিকে তেজটুকু আছে ষোল আনার ওপর সতেরো আনা। সে-বার আশ্বিন মাসে যখন দাঁত ছরকুটে বিছানায় পড়ে জ্বরে বেহুঁশ হয়েছিলে, তখন দেখে নি এসে পাড়ার লোক? এই মাগীর তো যত দোষ, এই মাগী না থাকলে যে কোন্ কালে শ্মশানঘাট আলো করতে? শেয়াল-শকুনে হাড়-মাংস ছেঁড়াছোড় করতো? পেট ভরেচে? না গুড় দিয়ে দু'খানা খাবে? ভাল হয়েচে? তবু তো নারকোল পড়ে নি। বাড়ীর লোক নারকোল এনে দেবে তবে তো হবে? তা না সকাল থেকে শোনো শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া—যম ভুলে রয়েচে কেন? যমে তোমায় নেয় না? পান ছেঁচে আনবো? ঠাণ্ডা হাওয়া হচ্চে—পুবে হাওটা দেখা দিয়েচে—এণ্ডিখানা নিয়ে আস, গায়ে দিয়ে গিয়ে বোসো—নইলে সর্দি-কাশির থুতু গয়েরে ঘর ভরিয়ে ফেললে সে তোমার যমকে ডেকে এনে পরিষ্কার করিয়ো বলে দিচ্চি স্পষ্ট কথা—এই ন্যাও গামছা—

খুড়ীমার স্বামী-শুশ্রূষার আতিশয্যে আমি কোথায় তলিয়ে গেলাম, একবার মাত্র আমার বাটিতে তালের বড়া দিয়ে আর আমার দিকে তিনি ফিরেও চাইলেন না।
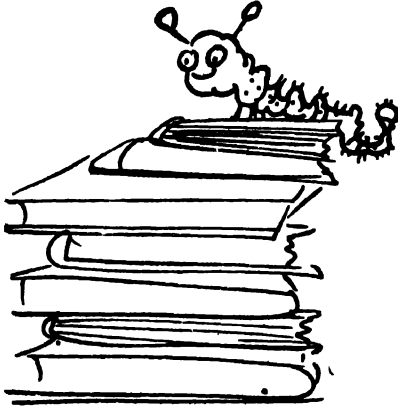
অসমাপ্ত

কোন্নগরে সাহিত্য-সভা করিতে গিয়াছিলাম।

আমিই সভাপতি। টানা মোটরে কলিকাতা হইতে আমায় লইয়া যাওয়া হইযাছে। সভাস্থলে পৌঁছিয়া বেজায় খাতির, কলিকাতা হইতে সমাগত আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত পুষ্পমাল্যশোভিত আমারও ফটো নেওয়া হইল স্থানীয় উৎসাহী সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত তরুণদের দ্বারা।

—এইবার আসুন, একটু জলযোগ—

—সভা কখন ? সময় হল তো—

—সভার আগে সামান্য একটু চা—

—বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—চল হে তবে। ওঁরা যখন নিতান্তই ছাড়বেন না—

—আসুন এদিকে—ইনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, এখানকার জমিদার—

—ও ! নমস্কার ! হেঁ—হেঁ—

একগাল হাসিয়া রায় বাহাদুর প্রতিনমস্কার করিলেন।

গরীবের বাড়ীতে—সামান্য একটু—হেঁ হেঁ—। আপনার নাম অনেকদিন থেকে শোনা ছিল। আজ বড় সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা

হল। আপনার শাপমোচন পড়ে আমাদের বাড়ীর এরা কেঁদে বাঁচে না। আমি এখনও পড়ি নি। সময় পাই নে, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বড় বেশি—যদিও রিটায়ার করেছি, তবুও কাজের অন্ত নেই।—ওঁরই নাম বিনয়বাবু? আসুন আসুন, আপনার বইও—মানে, পড়ি নি—তবে নাম কে না শুনেছে আপনাদের বাংলা দেশে, বলুন!

আমরা সবাই খ্যাতির গর্বে স্ফীত হইয়া উঠি।

প্রকাণ্ড ঘর। মাঝখান জুড়িয়া লম্বালম্বি একখানা বড় টেবিল সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা—চার পাঁচটা ফুলদানিতে ফুল সাজানো। বড় বড় চীনামাটির প্লেটে সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি ও রসগোল্লা। কাচের গ্লাস সারি সারি ও কাচের জগে জল। চায়ের সরঞ্জাম।

—আসুন, বসুন—এই যে, আপনি এইদিকে—বিনয়বাবু এখানে। ওরে ফল কই? এখনও কাটা হয় নি? কখন আর কাটবি? নিয়ে আয়।···ওহে সুশীল, তোমরাও বসে পড়, দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব? কেনারাম কোথায় গেল? ডেকে নিয়ে এস। বাঃ, চা খেয়ে নাও সকলে একসঙ্গে—না না, দেওয়ার লোকের অভাব হবে না।

—ওই ছবিখানা কার? বেশ সুন্দর চেহারা—

—আজ্ঞে, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের! ফ্রেঞ্চ গভর্নমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন—একেবারে ডান হাত বা বাঁ হাত। আর ওই বাঁ পাশে আমার পিতামহ। আমাদের আদি বাড়ী শশধরপুর, নিমতের কাছে। আমার ঠাকুরদাদার বাবার নামে গ্রামের নাম—নিমকির দারোগা ছিলেন সেখানে। ওই অঞ্চলে জমিদারী কেনেন—ওরে সিঙাড়া আরও নিয়ে আয়—খান খান—গরম সিঙাড়া সব বাড়ীতে তৈরী—দোকানের জিনিস মশাই এ বাড়ীতে ঢোকে না। আমার বড়বৌমার হাতে ভাজা সব। বড় ছেলে? সে এখানে নেই—কাস্টম্‌স্‌-এ কাজ করে—এবার আড়াই-শ হল—বিয়ে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর—তার শ্বশুরও জমিদার—রায় সাহেব হরিনাথ বাঁড়ুজ্যে, হালিসহরের—নাম শুনেছেন বোধ হয়? চা

দিয়ে যা এবার—

একটি বার-তের বছরের সুশ্রী বালিকা পান লইয়া আসিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে দবজার নিকট দাঁড়াইল।

—কি ওতে রে খুকি? পান? রাখ এখানে রাখ—এইটি আমার ছোট মেয়ে মিনতি। লজ্জা কি এঁদের কাছে। বেশ গান গায়, আজ সভাতে গান গাইবে এখন। আবৃত্তিতে আর বছর মেডেল পেয়েছিল—জলধর সেন শুনে কেঁদে ফেললেন একেবারে—

কর্তব্য ও শোভনতার খাতিরে খুকিটিকে কাছে ডাকিয়া দু-একটি মামুলি ছেঁদো কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার আবৃত্তি পুনরায় আমাদের কাছে করিবার জন্য জিদ ধরি, এবং পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করি—তাহলে ওঠা যাক সব—কি বলেন? সভার টাইম তো হল—

—ওরে কানাই, গাড়ীখানা আনতে বল্ চট করে, গেটের কাছে নিয়ে আসুক—

—না না, গাড়ী কি হবে। দরকার নেই রায় বাহাদুর। হেঁটেই এটুকু—

—বিলক্ষণ! ক্লাব ঘর এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। হেঁটে যাবেন কেন, গাড়ী যখন রয়েছে—নিয়ে আয় রে—বলে দিলি না গাড়ীর কথা?

সদলবলে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় একটি আট ন বছরের বালক পিছন হইতে আমায় ডাকিয়া বলিল—মা আপনাকে ডাকছে—

প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম আর কি। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলাম, কাকে?—কে ডাকছেন বললে খোকা?

বালকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাকে মা ডাকছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন,

কারণ আমি এ স্থানে পূর্বে কখনও আসি নাই, বালকটি আমায় কখনও দেখে নাই ইহা নিশ্চিত। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বাড়ী কোথায় খোকা ?

আর একজন বলিলেন—আরে ও তো আমাদের হরিজীবনের ছেলে। তুমি হরিজীবনের ছেলে না ? হ্যাঁ। ওই দোতলা বাড়ী। এঁকে ডাকছেন তোমার মা ? এই বাবুকে ?

বালক চারিদিক হইতে জেরায় একটু দমিয়া গিয়া সঙ্কোচের সুরে বলিল এই বাবুকেই তো মা বললেন ডাকতে। মা বললেন—যিনি চাদর গায়ে গাড়ীতে উঠছেন—

—যান মশাই, দেখে আসুন। ওর বাবার নাম হরিজীবন মুখুজ্যে, রেলে কাজ করে, আমাদের এখানে বাসা। চিনতে পেরেছেন ? হরিজীবন এখন বাড়ী নেই, বোধ হয় ডিউটিতে গিয়েছে। তোমার বাবা বাড়ী আছেন খোকা ?

বুঝিতে পারিলাম না কে হরিজীবন। কিন্তু এই বালকটির মুখের আদল আমার অত্যন্ত পরিচিত মনে হইল, যেন পূর্বে এ ধরনের মুখ কোথায় দেখিয়াছি।

বাড়ীর দরজায় পা দিতেই দরজার আড়াল হইতে যে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ইহাকে তো চিনি। অনেক দিন আগে ইহার সহিত খুব জানাশোনা ছিল। কিন্তু নাম কিছুতেই মনে আনিতে পারিলাম না। মেয়েটি আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কি যতীনদা, চিনতে পারেন ? কে বলুন তো ?

—এস এস—থাক্। কল্যাণ হোক। ভাল আছ বেশ ?...সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাণপণে মেয়েটির নাম মনে আনিবার চেষ্টা করিলাম। আমার মনে পড়িল ইহার সঙ্গে আলাপ হইবার একমাত্র সম্ভবপর স্থান হইতেছে কৃষ্ণনগর, সেখানে থাকিয়া কলেজে পড়িয়াছিলাম—অন্য

কোথাও মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নাই। কিন্তু ষোল-সতের বৎসর পুর্বের সেই দিনগুলিতে ভাবিয়া দেখিলাম অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল শুধু এই কারণে যে, আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম সে বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চা উপলক্ষে পাড়ার অনেক মেয়ে জড়ো হইত। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা ছোট ছোট মেয়েদের থিয়েটার প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের সাহায্য করিতে অনেকবার অনুরুদ্ধ হইতাম—সে উপলক্ষেও অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। সেখানেই যদি ইহার সহিত দেখাশুনা হইয়া থাকে তার নাম মনে আনিবার চেষ্টা বৃথা। কারণ their name is Legion.

—বসুন যতীনদা।

—ইয়ে—গিয়ে বসব বটে, কিন্তু ঘুরে আসি, সভা রয়েছে কিনা? সভার টাইম প্রায় হয়ে গেল।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—উঃ, আপনি আবার সাহিত্যিক হয়েছেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এসব ভাবলে আমার হাসি পায়। উঃ কি বখাটেই ছিলেন!

চুপ করিয়া রহিলাম—যদিও ঠিক বুঝিলাম না আমার মধ্যে বখাটেগিরির কি দেখিয়াছিল এ। এবং আমার তো মনে হয় না আমি সত্যিকারের বখাটে যাহাকে বলে তাহা ছিলাম কোনদিন। কিন্তু তাহা লইয়া তর্ক তুলিবার ইহা সময় নয়।

মেয়েটি আবার বলিল—কতদিন ভেবেছি আপনি কোথায় চলে গেলেন, আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না! কিন্তু ভগবান দেখা করিয়ে দেন এমনি করে।

আমি এবার ইহাকে অনেকখানি মনে আনিতে পারিয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিলাম—তোমার নাম শান্তি না?

মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি?

বলিতে পারিলাম না যে, সন্দেহ তো দূরের কথা, নামটাই মনে ছিল না এতক্ষণ কিন্তু এবার ইহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি। আজ পনের-ষোল বছর আগে ইহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল—তার পর আর কখনও দেখি নাই বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে অতগুলি মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটির ব্যবহার ছিল সর্বাপেক্ষা আন্তারক ও সরল. তখনকার মনোভাবে আমি ইহাকে সেইজন্যেই আমল দিই নাই—গায়েপড়া বলিয়া মনে করিতাম।

শান্তি বলিল—আপনি আজকাল থাকেন কোথায়?

—কলকাতাতেই আছি আজ আট ন বছর। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি।

—বিয়ে করেছেন?

—বহুদিন।

—ছেলেপিলে হয়েছে?

—চার মেয়ে। আর কিছু শুনতে চাও?

—বাজে কথা। আপনি কক্ষনো বিয়ে করেন নি।

—এ কথা ভাববার হেতু কি?

—আপনাকে আমি খুব ভালই জানি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। বলুন সত্যি কি না?

হাসিয়া ফেলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভালও লাগিল। পনের বছর পূর্বে এক-আধ বছরের জন্য যে মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ধরনের আলাপ হইয়াছিল তাহাকে আমার চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া ভাল লাগিবার কথা বটে। এ এমন এক ধরনের আত্মীয়তা যাহা অন্য কোনও উপায়ে প্রকাশ করা যায় না, বা অন্য কোনও ধরনের ব্যবহার দ্বারা ইহার স্থানও পূর্ণ হয় না।

বলিলাম—ধরে যখন ফেলেছ শান্তি, তখন মিথ্যে বলে লাভ নেই।

বিয়ে এখনও করি নি।

শান্তি সগর্বে বলিল—দেখুন, বললাম যে আপনাকে তখনই আমি চিনে ফেলেছিলাম ঠিক কিনা ভাল করে বলুন এবার।

বলিলাম—তাহলে এখন আমি আসি শান্তি—সভার পরে না হয় আসব এখন একবার। তোমার স্বামী কখন আসবেন? আলাপ হলে বেশ আনন্দ হত। সন্ধ্যের পর? বেশ আমারও আসতে রাত আটটা বাজবে, বুঝেছ।

—এখানে আজ রাত্রে খাবেন কিন্তু বলা রইল।

সভার পরে পুনরায় শান্তির ওখানে ফিরিতে প্রায় রাত নয়টা বাজিল। শান্তির স্বামীর সঙ্গে আলাপ হইল—বেশ ভাল লোক। আমার আসিবার খবর শুনিয়া ভদ্রলোক বাছিয়া বাছিয়া বাজার করিয়াছেন, সব রান্না শেষ করিতে শান্তির বেশ সময় লাগিবে—রাত দশটার কমে রান্না সাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হইল না। শান্তি চা করিয়া দিয়া গেল। আমি বসিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

একবার শান্তি রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিল বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে?

—ও জিনিসটির প্রাদুর্ভাব তোমাদের আতিথেয়তার কল্যাণে আদৌ হবার উপায় নেই। এসে পর্যন্ত খাওয়া চলছে। তুমি নিরুদ্বেগে বসে রাঁধতে পার যতক্ষণ খুশি।

আহারাদির পরে শান্তি বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। শান্তির স্বামী দু-একবার হাই তুলিয়া বলিলেন—আমার কাল খুব সকালে ডিউটি—যদি কিছু মনে না করেন আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি—

—বিলক্ষণ। শোবেন বই কি। আমি তাহলে—

—শান্তি, তুমি বরং বসে গল্প কর। আমি যাই। এঁর বিছানা করে

রেখেছ তো? মশারিটা খাটিয়ে দিও।—স্বামী উঠিয়া চলিয়া গেলে শান্তি বলিল—ঘুম পেলে শুনছি নে কিন্তু। আজ সারা রাত বসে গল্প করতে হবে। কতকাল পরে দেখা।

—সারা রাত! বল কি।

হঠাৎ শান্তি বলিল—কেন না? আপনি আমায় কত কষ্ট দিয়েছিলেন জানেন?

আমি অবাক হইয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—কিসের কষ্ট?

—কিসের কষ্ট জানেন না তো? জানবেনই বা কি করে। আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি। বলিয়াই সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট কাঠের বাক্স আনিয়া আমার সামনে খুলিল। একটা পত্র আমার সামনে ধরিয়া বলিল—দেখুন পড়ে।

পড়িয়া দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। আমার মাসিমা পরলোক গমন করিয়াছেন আজ দশ বছর কি তার বেশি। তাঁর হাতের লেখা খুব ভাল করিয়াই চিনি। মাসিমা শান্তির মাকে চিঠিতে আমার সহিত শান্তির বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন এই চিঠিতে।

বলিলাম—তুমি এ পত্র পেলে কোথায়?

—যেদিন এ পত্র এসেছিল, সেই দিনটি থেকে পত্রখানা আমার কাছে। আপনিও তার পর আর কখনও আজিমগঞ্জে যান নি। সেই শ্রাবণ মাসে যে চলে এলেন—এই আবার এতকাল পরে দেখা।

—কিন্তু আমি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না একথা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে শান্তি?

শান্তি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানতেন না মানে? সব জানতেন।

—কেন বল তো তুমি একথা বলছ?

শান্তি হাসিয়া ঘাড নাড়িয়া বলিল—সব জানি যতীনদা, সব জানি। আমার চোখে আবার ধুলো দেবার চেষ্টা? একবার তো করে দেখলেন, ঠকে গেলেন নিজেই।

—কি চেষ্টা করলুম তোমার চোখে ধুলো দেবার?

—ওই যে বললেন বিয়ে কবেছেন, চার মেয়ে হযেছে। আমি আর জানি নে আপনাকে? বিয়ে আবার আপনি করবেন! কেন বিয়ে করেন নি, তাও কি আমার অজানা ভাবছেন? এক এক সময় তাই মনে হয়েছে, এই ষোল বছরের মধ্যে—যদি কখনও দেখা হয়, পায়ে ধরে আপনার কাছে মাপ চেয়ে নেব। আমি তো গিয়ে ছই—আপনি কেন যাবেন সেই সঙ্গে?—সেই কথাটা বলবাব সুযোগ পেলুম এতকাল পরে।

বিস্ময়ে আমার মুখে কথা যোগাইল না। শান্তি বলে কি! এমন ভুলও মানুষেব হয়? সমস্ত কথাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় নয় এটা—তবুও এক চমকে ইহাব মনেব অনেকখানিই দেখিতে পাইলাম। সভা করিতে আসিয়াছি বিদেশে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এতখানি দরদ দেখাইবার ঠিকমত কারণ আমি অনেক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—অনেকখানি পবিষ্কাব হইয়া গেল এবার।

কিন্তু মেয়েটি কি ভুলই নিজেব বুকের মধ্যে এই ষোল বছব পুষিয়া রাখিয়াছে! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল কতকগুলি কথা জানিবার। বলিলাম—আজ যখন এখানে এলাম, তুমি কি করে আমায় চিনলে এতকাল পরে?

—সভার জন্যে কাগজ ছাপিয়ে বিলি করেছিল—আপনার নাম দেখলাম। তা ছাড়া স্বরজিৎবাবুর ছেলে আপনার পরিচয় সেদিন দিচ্ছিল ওঁর কাছে আমাদের বাড়ী বসে। আমি তখনই ওঁকে বললাম,—যতীনদা আমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। উনি বললেন, রায়

বাহাত্নরের বাড়ী আপনাদের চা খাওয়ার আয়োজন হয়েছে—তাই শুনে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—দেখেই চিনলে এতকাল পরে?

—ওমা, কেন চিনব না! আপনারা আমাদের ভাবেন কি?

এখন ইহাকে ভাল করিয়াই মনে পড়িয়াছে—আমার কিছুদিনের বাল্যসঙ্গিনী একটি অত্যন্ত মুখরা, চঞ্চলা বালিকার ছবি। আবছায়াভাবে ইহার ছু-একটি বাল্যলীলাও মনে পড়িতেছে।

বলিলাম—শান্তি, নিতাইয়ের মা সেই বুড়ো গিন্নীর শিব চুরির কথা মনে পড়ে?

শান্তি হাসিয়া বলিল—খু-উ-ব। চুরি করলেন আপনি আর ধনা—ধনাকে মনে আছে?—সে আজকাল পাটের কলে কাজ করে নৈহাটিতে, মধ্যে একদিন এখানে এসেছিল আজ বছর তিন চার আগে—আর গাল খেয়ে মলুম আমি আর ছোড়দি।

—কেন, তোমরা তো সাহায্য করেছিলে, কর নি? পূজোর ঘরের শেকল তুলে দিতে বলেছিল বুড়ো গিন্নী—শেকল তুলে না দিয়ে বলেছিলে, দিয়েছ। আর একদিন তুমি জাঁতি দিয়ে আঙ্গুল কেটে ফেলেছিলে মনে আছে? কেঁদেছিলে খুব।

শান্তি ছেলেমান্নুষের মত মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল—হ্যাঁ, কেঁদেছিলে খুব! ছাই মনে আছে। কাঁদবার মেয়েই আমি ছিলাম কিনা।

—তবু যদি আমার মনে না থাকত!

—কি মনে আছে শুনি?

—মনে আছে তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

শান্তি অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, কি মিথ্যেবাদী!

আমার হাসি পাইল। বলিলাম—ছেলেবেলার মত ঝগড়া পাকিয়ে তুলছ শান্তি। অভ্যেস কি কখনও যায়।

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা, যতীনদা—শিবতলার বটগাছে ভারা বেঁধে দিতে তো ফি বছর পরীক্ষার আগে—খুলেছিলে কোনদিন ?

সত্যিই অনেক কথা দেখিতেছি মনে রাখিয়াছে শান্তি। আমার নিজেরই মনে ছিল না। মেয়েরা বড় মনে রাখে।

রাত অনেক। শান্তি বলিল—আর না যতীনদা, রাত হয়েছে, শুতে যান। যদিও আমার ইচ্ছে করছে আজ সারারাতটা আপনার সঙ্গে বসে গল্প করি। কাল সকালে উঠেই যেন চলে যাবেন না, খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে—

—কাল তা কি করে হবে শান্তি? কাল সোমবার, সব খোলা—খেয়ে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। আমি সকালে চা খেয়েই চলে যাব।

শান্তি কর্তৃত্বের সুরে বলিল—সে হবে এখন। সেজন্যে আপনার ভাবতে হবে না—কাল সকালে উঠে দুটো আপিসের ভাত দিতে আমার আর হাত পা খোঁড়া হয়ে যাবে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিলাম ব্যাপারখানা। শান্তিকে প্রতারণা করিলাম বটে, স্বীকার করি সেটা বড়ই খারাপ কাজ, কিন্তু সত্য কথা খুলিয়া বলিলেই কি সে খুশী হইত? ওর জীবনে হয়তো এইটুকু ভাবিয়াই উহার সুখ—কেন সে সুখটুকু নষ্ট করিব?

পরদিন সকালে না খাওয়াইয়া শান্তি কি ছাড়ে! খুব ভোরে উঠিয়া এটা সেটা রাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সাড়ে আটটায় আমার গাড়ী। তার অনেক আগে সে আমায় চার পাঁচ রকমের তরকারি করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আবার কবে আসবেন দাদা ?

—সময় তো পাই নে। তবে—ইয়ে—আসব বইকি।

হঠাৎ খপ করিয়া আমার হাত দুখানা তাহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া আর্দ্র কণ্ঠে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—না দাদা, আমি সব জানি, সব বুঝি। আপনি যে নিজের জীবনটা এভাবে কাটিয়ে দিলেন, সেজন্যে আমার মনে তুষের আগুন জ্বলে দিন-রাত। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন বলুন ?

—কি অনুরোধ বল শান্তি।

—আপনি বিয়ে করুন—করতেই হবে আপনাকে বিয়ে। আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াবেন না। বলুন অনুরোধ রাখবেন ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

শান্তি আবার বলিল—চুপ করে থাকলে হবে না! আমার কাছে বলে যান।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি শান্তি।

—বেশ, তা ভাবুন। এইটুকু যে বলেছেন এবার সেই যথেষ্ট। আবার এই মাঘ মাসে সরস্বতী পূজোর সময় আসবেন বলুন ?

—আচ্ছা, তা বরং—

—না, ওসব শুনব না। বরং টরং না, আসতেই হবে বলে দিলাম। আমি পথের দিকে চেয়ে থাকব।

—আসব।

পথে উঠিয়া দেখি, শান্তি রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা বলিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

অভয়ের অনিদ্রা

অভয়ের সারারাত্রি ঘুম হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও সে তাহার চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিল না। সেই যে আচমকা কিসের যেন শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তার পর আর কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। চক্ষু যেন তাহার ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বেশ শান্তিতে সে ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ কে যেন তাহার দ্বারে করাঘাত করিয়া গেল। সেই শব্দে অভয়ের সুপ্ত চেতনা জাগিয়া উঠিল। অভয় ধীরে ধীরে তাহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে ক্ষীণপ্রায় হ্যারিকেনটি উজ্জ্বল করিয়া দিল, ধীরে ধীরে চারিদিকে সাবধানে চাহিয়া দেখিল। না, কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য ঘটে নাই। যেখানকার জিনিসটি যেমন ছিল তাহা ঠিক সেখানেই আছে, একটুকু নড়ে নাই। অভয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভয় তাহার নিশ্চয় অহেতুক। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল হয়তো ডাকাত পড়িয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হইল ইহা কলিকাতা, ডাকাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই আদৌ। তার পর মনে পড়িল হয়তো চোর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিল। চোরের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তবে কিসের এই বিকট শব্দ? অভয় ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল।

মুহূর্তে তাহার পাশের শূন্য বিছানায় নজর পড়িল। সাতদিন আগে ঐ শয্যা পূর্ণ ছিল। সাতদিন আগে তাহার এ গৃহ এমন মহাশূন্যতা প্রকট করিয়া খাঁ খাঁ করিত না। মনে পড়িল বেচারা বকুলের কথা—তাহার সহধর্মিণী, তাহার স্ত্রী, অগ্নিসাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিন বছর পূর্বে এই শ্রাবণের এক শুভলগ্নে বকুলকে সে সগোত্রের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। সেদিনও আকাশে এমনি করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন তাহার মা ছিলেন। দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। তার পর একদা পরপার হইতে মার ডাক পড়িল। বকুল নিপুণ হস্তে সংসারের হাল টানিয়া ধরিল। অভয় তাহার পানে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। মাতার অভাব বকুলকে দিয়া পূরণ করা হইল। প্রথম প্রথম বকুলকে অবশ্যই বেগ পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু অচিরেই সে অভ্যস্ত হইয়া গেল। সংসারের হিসাবপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না পর্যন্ত তাহাকে নিজ হস্তে করিতে হইত।

কালক্রমে বকুল স্বামীর বিরাট বহুবিস্তৃত সংসারের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া গেল যে তাহার অভাব একদিনও সহ্য করা যাইত না। বাপের বাড়ী যাইবার ফুরসত সে পাইত না। ভোর হইতে উঠিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্মে তাহার বিশ্রাম ছিল না। কলের পুতুলের ন্যায় সে অক্লান্ত কর্ম করিয়া যাইত। একবেলা তাহার অসুখ করিলে সংসার অচলপ্রায় হইয়া যাইত। ছেলেমেয়েদের পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না। অতিথি-অভ্যাগত ফিরিয়া যাইত। খাদ্যদ্রব্য এমনই অখাদ্য হইত যে কাহারও মুখে তুলিবার রুচি হইত না। পাশের বাড়ীর চাঁপা একদা মধ্যাহ্নে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে বকুলকে দেখিয়া বলিল, দিদির চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গেল!

বকুল কহিল, হবে না ভাই? যা খাটুনি।

চাঁপা কহিল, খাটুনি একটু কম করতে পার!

বকুল মৃদু হাসিল, তাহার মুখে প্রশান্তির ছায়াপাত হইল। সে বলিল, খাটুনি কম করব কি করে ভাই। নিজের সংসার, পর তো আর কেউ নয়। একটুকু বিশ্রামের ফুরসত নেই। আজ যদি যম আমায় নিতে আসে তাহলে তাকে বলব, একটু বোস, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

চাঁপা কহিল, বালাই ষাট, ওকি অলক্ষুণে কথা ভাই!

বকুল কহিল, আমার আবার লক্ষণ অলক্ষণ! আমি যমের অরুচি।

এহেন বকুলকে পাইয়া অভয়ের বিপর্যস্ত সংসারের মধ্যে বেশ একটা সুশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অভয় বকুলকে নিঃশব্দে চুপিচুপি নাকি ভালবাসিয়াও ফেলিয়াছিল। কেন না, যে অভয় বন্ধুদের ফেলিয়া একদণ্ড কাটাইতে পারিত না, সেই কিনা বিবাহের পর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির হইয়া গেল। গৃহকেই সে যথাসর্বস্ব জানিয়া ফেলিল। বন্ধুরা বিদ্রূপ করিতে কসুর করে নাই। বলিল, বৌদি তোকে এমন করে তুক করে ফেলবে জানলে কখনও বিয়ে করতে দিতুম না।

কেহ বলিল, বৌদির দেওয়া খাবার-টাবার দেখে খাস বাবা।

কেহ বলিল, কামরূপ-কামিখ্যের ভেড়া হয়ে যাস নে যেন।

অভয় কেবল হাসিতে লাগিল। কাহারও কথায় সে জবাব দিল না।

এমনি করিয়া অভয়ের দিন কাটিতে লাগিল। বন্ধুরা ধীরে ধীরে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহাকে সকলে বিস্মৃত হইল। আপিসের ছুটি হইলে সন্ধ্যায়, বা রবিবারে, কেহ তাহার বাড়ী আর তাস পাশা খেলিতে আসিত না। তাহার বহুদিনের বৈঠকখানা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যায় আলো জ্বলিল না, বৈকালে ঝাঁট পড়িল না, অভয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বকুল

একদিন জিজ্ঞাসা করিল, ওরা আর তাস খেলতে আসে না কেন ?

অভয় মুক্তির হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, অমন বিলাসিতা করবার সঙ্গতি আমার নেই।

বকুল কহিল, এতদিনের অভ্যেস !

—অভ্যেস বলে তো সব-কিছু করা যায় না। পয়সা চাই—চকচকে পয়সা। তাস চাই, আলো চাই, চা চাই, বিস্কুট চাই। পয়সা দিয়ে তো অমন বন্ধুত্ব কিনতে পারি না বকুল। পয়সা কোত্থেকে আসে সে কথা কি কোনদিন চিন্তা করেছ একবার।

কথা শেষে অভয় হা হা করিয়া তাহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল। বকুল বলিল, আমার বিয়ের পর তার এমনি করে যবনিকাপাত করলে আমায় লোকে দুষবে, এটা জান তো ?

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, লোকে মনে করবে তাদের এ আনন্দ রুদ্ধ হয়েছে আমারই ষড়যন্ত্রে।

অভয় আবার সেইরূপ সারা ঘরটি কাঁপাইয়া হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, ওঃ! দুষবে তো তোমায় ? তা যত খুশি দোষ দিক। তুমি তো আর শুনতে যাচ্ছ না। তাতে আর কোন ক্ষতি নেই।

দুই মাস অভয়ের সহিত ঘর করিয়া বকুল বেশ বুঝিয়াছিল যে তাহার স্বামীর হাতটানটা বেশই আছে। হাতের আঙুল নাকি তাহার ফাঁক হয় না! বিবাহের পর এই সুযোগে সে বন্ধু-বান্ধবকে ফাঁকি দিয়া বাসিল। সাবান স্নো কিনিয়া দিতে বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, সেকালের দোহাই পাড়িয়া স্ত্রীকে আধুনিকতার বিশেষণে জর্জরিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সেই হারানো যুগের সোনার দিনের বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া সে আত্মরক্ষা করিত। বকুলের মুখে আর কোন কথা সরিত না। আর তাঁহার বলিবারই বা কি থাকিত ? তখন তাহার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিনটি বৎসর কোন্ ফাঁকে কাটিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অকস্মাৎ একদিন বকুলের সামান্য অসুখের সামান্যভাবেই সূত্রপাত হইল। বুধবার রাত্রি দুইটায় সে অভয়কে সহসা ডাকিতে লাগিল। অভয় জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

বকুল বলিল, আমার বড্ড শীত করছে। উঃ হুঃ হুঃ! জানালা দরজা সব বন্ধ করে দাও। আমার ঘাড়ের ওপর লেপ দাও, গায়ের কাপড দাও, তোশক দাও, গদি দাও, যা কিছু আছে সব দাও।

অভয় লেপ দিল, গায়ের কাপড দিল। বকুলের শীত তবুও তিলার্ধ কমিল না। সে হি-হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল—আরও দাও, আরও দাও।

দিবার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তথাপি বকুল কাঁপিতে লাগিল। অভয় তার কপালে হাত দিয়া দেখিল গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন এই গভীর রাত্রে সে কি করিবে, করিবাব তাহার কিই বা আছে? সে কি ডাক্তার ডাকিবে? ডাক্তারেব কথা স্মরণ হইলে তাহার মনে শিহরণ জাগিল। ডাক্তার কবিরাজ ডাকা তো বিলাসিতার নামান্তর। আর রাত্রে নাকি ডাক্তারের ডবল ভিজিট। না, এ সামান্য জ্বরে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। একবার ভাবিল মাথায় আইসব্যাগ দিবে বা কপালে জলপটি দিবে। কিন্তু কোথায় আইসব্যাগ, কোথায় ওডিকোলন! এদিকে বকুল চীৎকার করিতে লাগিল—আমার মাথা জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।

অভয় বলিল, বেশ তো ভালমানুষ খাওয়া-দাওয়া করে শুলে। হঠাৎ এমন কিই বা অসুখ করল বল দিকি? এ নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া। আমি হলফ করে বলতে পারি এ ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বকুল তখন গান জুড়িয়া দিয়াছে, অনর্গল এলোমেলো বকিয়া চলিয়াছে, সজনি, কি পুছসি…ঐ যমুনার কূলে…শ্যাম কালো, তার

কালো মাথার চূড়া, তার মোহন বাঁশি···

অভয় বিপদ গনিল। সারারাত্রি স্ত্রীর মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। নিজের শরীরের উপর দিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা সে করিতে প্রস্তুত। শুধু এই রাত্রে অযথা সে খামোকা পয়সা খরচ করিতে পারিবে না। পয়সা তাহার বুকের বত্রিশখানা হাড়ের সামিল। বকুল সারারাত্রি হাসিয়া-কাঁদিয়া-গাহিয়া চীৎকার করিয়া কাটাইয়া দিল। জ্বর কমিল না। ভোর হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া হাজির হইল। যথাসময়ে পাড়ার একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, টাইফয়েড। রোগ বড় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

অভয় প্রমাদ গনিল। বিপদ কি মানুষেব এমনি করিয়াই হয়? তাহার বড় ইচ্ছা হইল সে ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু কাঁদিল না, বরং স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য জলের মত না বলিয়া না কহিয়া দশটি টাকা খরচ করিয়া বসিল। হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্কটা হয়তো আরও বড় হইবে ; কিন্তু স্ত্রী তাহার ভাগ্যবতী স্বামী-সোহাগিনী, 'পতি পরম গুরু'কে অযথা ব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিল। পরের দিনই সে ইহজগতের মায়া কাটাইয়া গোলোকধামে চলিয়া গেল, কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিল না।

অভয় পত্নীশোকে ধূলিতলে আছড়াইয়া পড়িল। সে আর্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া রমণীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাহার অত সাধের তাসের ঘর মরণের তীব্র আঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, কেবল তীব্র সুরে শোকপ্রকাশ করিয়া চলিল। সেইসব পুরনো দিনের হারানো বন্ধুরা আজ বিপদ দেখিয়া আসিয়া জুটিল। সেই হাবু, পটল, রমেন, ভূপেশ, বিপিন—সকলেই একে একে দেখা দিল। দীর্ঘ তিন বৎসর যাহারা অভয়ের

ছায়া পর্যন্ত মাড়াইত না, সকলে যাহার মুখ দেখিলে অযাত্রা বলিয়া ঘোষণা করিত, অযথা হাঁড়ি ফাটিবার আশঙ্কায় সারাদিন সচকিত থাকিত, আজ সেই অভয়ের বিপদে আর তাহারা, বেচারার হাত দিয়া জল গলে না বলিয়া, দূরে সরিয়া রহিল না। অভয় তাহাদের দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারা অভয়ের কান্না দেখিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা জানে অভয় তাহার স্ত্রীকে কি দারুণ ভালবাসে, স্ত্রীর অভাবে তাহার জীবন কিরূপ বিষময় হইয়া যাইবে। অগত্যা তাহারা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় শবদাহ শেষ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল।

সত্যই নাকি অভয় তাহার স্ত্রীকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিত। সে ভালবাসায় নাকি এতটুকু গলদ ছিল না। উঠিতে বসিতে সব সময়ে সে 'বকুল' 'বকুল' বলিয়া অস্থির হইত। বকুল হাসিয়া বলিত, আমি মলে তুমি কি করবে বল তো?

—শুভ্র তাজমহল।

বকুল হাসিমুখেই বলিত, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি অত খরচ করো না।

অভয় কহিত, পয়সা-কড়ি তো সবই তোমার। তোমার পয়সা তোমার জন্যে খরচ করব, তাতে পায়ে পড়ে বাহাদুরি কেনবার কি এমন আছে।

—বেশ, মানলুম সমস্ত পয়সাকড়ি আমার, আমার কলকাতা শহরে চোদ্দখানা বাড়ী, তার মাসিক আটশ' টাকা ভাড়া। এখন আপাতত দয়া করে আমার জন্যে একখানা লালাবাই সাবান এনে নাও দিকি।

অভয় তাহার স্ত্রীকে প্রবোধ দিল, পাগল নাকি! ফেনা করে সাড়ে চার আনা পয়সা জলে দেবে? না, ও বিলাসিতা আমাদের এখানে চলবে না।

সেই স্ত্রীর মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হইয়া অভয় ছয় দিন ছয় রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। বন্ধুরা সকলে বিপদ গনিল। এই নিদারুণ শোকাবেগের হাত হইতে কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। সকলে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল, প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিরহে কাতর মানুষ-টিকে সেই বহুশ্রুত দার্শনিক মতবাদ দিয়া বুঝাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। সেই—মানুষ মরণশীল, মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করা নাকি দুর্বলতার লক্ষণ, রাজর্ষি জনকের নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত, সরিষা আনিবার জন্য বুদ্ধের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্মরাজ বকের প্রশ্ন—ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ কথায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। অভয় তবুও প্রথমটা ভোলে নাই।

ছয় দিন ছয় রাত্রির পর আজ সবে সে পত্নীশোক কিঞ্চিত বিস্মৃত হইয়া সামান্য ঘুমাইয়াছে, এহেন সময়ে সেই বিকট শব্দ হইল। অভয় একদৃষ্টে বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিয়া রহিল। বুকখানার ভিতর হু হু করিয়া উঠিল। ডাকাত নয়, তবে চোর হইলে হইতে পারে।

কিন্তু চোর বলিয়াও তো বোধ হইতেছে না।

তবে এ কিসের শব্দ? অভয় দরজার একটি গর্ত দিয়া দেখিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না, আকাশের মাঝে উজ্জ্বল চাঁদ সাদা, দীপ্তিময়ী তারকা-রাশি। অভয় বিছানায় আসিয়া ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কিসের এ শব্দ?

আচমকা মনে পড়িল হয়তো তাহার মৃত স্ত্রীর কীর্তি, হয়তো বেচারী এ জগতের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়াও স্বামীকে ভুলিতে পারে নাই। তাই কি নিঃশব্দ রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে? তৎক্ষণাৎ ভয়ে তাহার গা ডোল হইয়া শিহরিয়া উঠিল। না, স্ত্রীর এই উৎকট ভালবাসা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত চেতনা লোপ পাইতে লাগিল। বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিবার সাহস আর তাহার রহিল না। সমস্ত শোক-দুঃখ-বেদনা ভয়ে

ও ভাবনায় রূপান্তরিত হইল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শয্যার উপর অবশভাবে বসিয়া রহিল। কি সে করিবে? চিৎকার করিবে, না জ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে? ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। সে ছেলে-বেলায় কত ভৌতিক কাহিনী পড়িয়াছে, আজ কেমন যেন সেই সব নানা ভৌতিক ব্যাপার জীবন্ত হইয়া উঠিল! সে বন্ধ-জানালা-দরজার পানে সচকিত চিত্তে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কে জানে কোন্ মুহূর্তে দম্‌কা বাতাসে জানালা-দরজাগুলি হুড়মুড় করিয়া খুলিয়া যায়।

অকস্মাৎ আবার সেই পূর্বের ন্যায় দ্বারে শব্দ হইল। বাহির হইতে মানুষে যেন দ্বার ঠেলিতেছে। অভয় ছুটিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া সেই ফুটা দিয়া বাহিরে তাকাইল। কিন্তু আশ্চর্য, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিল একটি হৃষ্টপুষ্ট ভিটামিনের মাপকাঠির চিহ্নস্বরূপ পাঞ্জাবী ইঁদুর হন্‌হন করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়িয়া পলাইয়া গেল।

বিপুল বিস্ময়ে অভয়ের মুখে কোন কথা সরিল না, কেবল তৃপ্তির ও প্রশান্তির হাসি খেলিয়া গেল। যাহা হউক, যদি ডাকাতই পড়িত বা চোরই আসিত। কতদিন হইতে সে ভাবিয়াছে গহনাপত্র পয়সা-কড়ি অন্যত্র সাবধানে রাখিয়া দিবে, কিন্তু ফুরসত পায় নাই। তাই আজ গুপ্তস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিবে তাহার সব-কিছু মজুত আছে কিনা। ধীরে ধীরে সে সিন্দুক খুলিয়া ফর্দ মিলাইয়া তাহার সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। ফর্দ মিলাইতে মিলাইতে তাহার তৃষ্ণা পাইয়া গেল। ভাবিল বকুলকে জল আনিতে বলে, হয়তো বলিতও তাহাকে, যদি-না তৎক্ষণাৎ মনে পড়িত তাহার মৃত্যুর কথা। না, একটা চাকর ও একটা ঝি না রাখিলে চলিবে না। বকুল আসিয়া পর্যন্ত সে উহাদের বিদায় করিয়াছিল; কিন্তু আজ তো তাহাদের না হইলে অভয়ের আদৌ চলে না। কম করিয়াও খাওয়া-পরা বাদে তাহাদের জন্য অভয়কে মাসে অন্তত দশটা টাকা ব্যয় করিতে হইবে, বৎসর শেষে

এই দশটি টাকা আবার এক শ' কুড়ি টাকায় পরিণত হইবে! বাৎসরিক মোটা অঙ্কটা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

যথাসময়ে রাত্রি দুইটা বাজিল। অভয় তখন বাক্স হাতড়াইতেছে। তাহার চুল উস্কো-খুস্কো হইয়া গিয়াছে, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, ঘন ঘন অস্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িতেছে। গভীর রাত্রেই সে স্ত্রীর শূন্য শয্যায় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আবার সে বিনাইয়া বিনাইয়া চাপা-কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ফটোখানার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ফটো দেখিয়া বকুলকে চেনা মুশকিল। কোন্ মান্ধাতার আমলে ঐখানি তোলা হইয়াছিল। তার পর ফটো তুলিবার প্রয়োজন বা সদিচ্ছা আর তাহার হয় নাই।

দুইটা তিনটা করিয়া রাত্রি ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অভয়ের চোখে তখনও ঘুম নাই। তখনও সে তাহার দীর্ঘ চুলের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিয়া কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। হয়তো সে পত্নীশোকে বিবশ হইয়া গিয়াছে। শয্যা হইতে উঠিয়া অভয় ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরে আকাশের পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিল। চাঁদ অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে, তারায় তারায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর সহসা হু হু করিয়া উঠিল। কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। ঘুম দূরের কথা, সে তাহার বিছানায় শুইতেই পারিল না। শয্যা তাহাকে কাঁটার ন্যায় বিঁধিতে লাগিল।

একবার ভাবিল যে লোটাকম্বল লইয়া যেখানে দুচোখ যায়, সেখানে চলিয়া যাইবে। আর সে সংসার করিতে পারে না। সে হয়তো পাগল হইয়া যাইবে। পাগল হইবার তাহার বাকিই বা কি আছে! বিপদ

যখন আসে তখন সে তো আর একা একা চুপি চুপি আসে না। এমন করিয়া অঘটন ঘটিলে সে কি করিয়া বাঁচিবে?

আজ সে যে শোক পাইয়াছে তাহার কাছে তাহার মৃত্যুজনিত শোক সম্পূর্ণ তুচ্ছ। স্ত্রীর শোক সে ভুলিতে পারে; কিন্তু এ শোক তো সে কখনও কোন কালে ভুলিতে পারিবে না! গত ছয় দিন ছয় রাত্রি এই দারুণ উদ্বেগে কাটিয়াছে, যতটা স্ত্রীর বিরহে না হউক, তাহাব বেশি ওই বৎসরে এক শ' কুড়ি টাকা খরচের ভয়ে। সেই ভয়েই তাহার ছয় দিন ছয় রাত্রি ঘুম হয় নাই। বকুল ছিল সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার মৃত্যুতে সংসার একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে; কি দিয়া অভয় সে সংসারকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অভয় আজ ছয় দিন ধরিয়া হদিস পায় নাই। স্ত্রী মানুষের মরে, অভয়ের তাহাতে তত দুঃখ নাই। কিন্তু ঐ যে কথা আছে, ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে—তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অভয় ভাগ্যবান হইল কই?

স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার আদৌ দুঃখ নাই। সে তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সটি আবার ফর্দ মিলাইয়া দেখিল। না, সে জিনিসটি নাই। অভয়ের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মানুষ মানুষকে কি এমন করিয়াই ফাঁকি দেয়? লোকসানের পর এমন করিয়া লোকসান হইলে সে কি করিয়া সহ্য করিবে? না, এই লোকসান সহিয়া সে কখনও সংসারের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। গহনার বাক্সটির পানে সে শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীর ব্যবহৃত গহনার সব কিছুই আছে, সব কিছুই সে নিপুণ হস্তে মৃত বকুলের গা হইতে খুলিয়া লইয়াছে। কাশী হইতে তাহার ছোট বোন সেই যে কারুকার্যখচিত কাচের চুড়ি চারগাছি পাঠাইয়াছিল, সেগুলিও সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে। সব তুলিয়াছে, কিন্তু ভুল করিয়াছে বকুলের কানের ফুল দুটি খুলিতে

এক আনা সোনা দিয়া সে ফুটি সে গড়াইয়াছিল। চুলের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সে ফুটি শবদেহের সহিত গিয়া চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে।

সেই কারণে অভয়ের আজ সারারাত্রি ঘুম হইল না। স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে; কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া? যতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ঐ ফুল ফুটির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মাথায়। আর অভয় কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল, সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না?